যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী

যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY
Calcutta

সত্যব্রত লাইব্রেরী
১৯৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

পঞ্চম সংস্করণ
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬২

প্রকাশক
সত্যব্রত গুহ
সত্যব্রত লাইব্রেরী
১৯৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট
শংকর নন্দী

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্

প্রচ্ছদপট ছেপেছেন
মোহন প্রেস
১, করিশচার্চ লেন
কলিকাতা—৯

ছেপেছেন
ধীরেন দত্ত
নবীন প্রেস
৬, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

তিন টাকা

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে নবীন কবি ও সাহিত্যিকগণ বাঙ্‌লা দেশে আবির্ভূত হন, চারুচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আজিকার বাংলা সাহিত্যে যে নবীন কথাসাহিত্যিকগণ দেখা দিয়াছেন, তাহাদের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা গণসাহিত্যের এই আধুনিক পরিণতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, চারুচন্দ্রের নাম তাহাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইবার যোগ্য। যে বাস্তবতা ও স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধগত বিশ্লেষণমুখিতা এখনকার কথাসাহিত্যে অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত, তাহার সন্ধান চারুচন্দ্রের উপন্যাসে পাওয়া যায়।

চারুচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আধুনিক যুগধারাকে আগাইয়া আনার সহায়করূপে অবশ্যই স্মরণীয় থাকিবে।

প্রবোধকুমার সান্যাল

এম্-এ এগজামিন দিয়া বিমল হঠাৎ অত্যন্ত ধার্মিক হইয়া উঠিল—সে তীর্থ-পর্যটনে মন দিল। এই পর্যটন তাহাকে যেন নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছে; কত দিন ধরিয়া সে শুধু ঘুরিয়াই বেড়াইতেছে। কোথাও সে তে-রাত্রির বেশী বাস করে না; কিন্তু সমস্ত দেশ ঘুরিয়া আসিয়া একবার করিয়া প্রয়াগে সে হপ্তাখানেক বিশ্রাম করে। সেই কি বিশ্রাম? সে সকালে সন্ধ্যায় ত্রিবেণীর ঘাট হইতে যমুনার পুল, আর যমুনার পুল হইতে ত্রিবেণীর ঘাট কেবলি ছুটাছুটি করে, যেন এই পথের মাঝখানে কোথায় তাহার সমস্ত জীবনের সঞ্চিত রত্ন খোয়া গিয়াছে।

সে এম্-এ পাশ করিল। তবু তাহার ভ্রমণ থামিল না। সে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুঁটিয়া বেড়াইতেই লাগিল। তাহার পিতা তাহাকে তিরস্কার করিলেন, বন্ধুরা বিদ্রূপ করিল, মাতা চোখের জল ফেলিলেন, কিন্তু বিমলের নেশা কেহ ছাড়াইতে পারিল না। ফার্ষ্ট ক্লাশ এম্-এ পাশ করিয়াও সে কোনো উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করিল না; বাপের রোজগারের পয়সা সে টো টো করিয়া নষ্ট করিতেছে। মা-বাপ ভাই বন্ধু সকলে তাহার বিবাহ দিবার জন্য ঝুলাঝুলি করিল, কিন্তু কিছুতেই বিমলকে ঘরে আটক করিতে পারা গেল না। সকলে মনে করিল সে নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হইবে। সেই ভয়েই তাহার বাপ-মা তাহাকে আর বেশী ঘাঁটাইলেন না; যাহাতে বেশভূষায় ও ভ্রমণে গৃহস্থের ভাবটা অন্তত বজায় থাকে এজন্য তাহাকে খরচ যোগাইতে তাঁহারা কৃপণতা করিতে পারিতেন না।

ইহার উপর তাহার আর-এক খরচ ছিল—খয়রাৎ। সে ভিখারিণী দেখিলেই তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে তাহাকে একবার দেখিয়া লইয়া তাহাকে কিছু দান করিত। তাহার উপর সে ভিখারিণী যদি যুবতী হইত তবে ত' বিমল আর স্থির থাকিতে পারিত না; তাহার মুখ একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। কতবার সে এক জায়গায় টিকিট করিয়া ট্রেণে যাইতে যাইতে মাঝ-পথের কোনো ষ্টেশনে কোনো যুবতী ভিখারিণীকে দেখিয়া সেখানেই নামিয়া পড়িয়াছে; কতবার সে এমনি করিয়া ট্রেণ ফেল্ করিয়াছে। ভিখারিণীদের প্রতি এত যার দয়া, সে কিন্তু ভিখারীদের দিকে একটিবার ফিরিয়াও চাহিত না।

বিমল একবার এমনই ভ্রমণে বাহির হইয়াছে; ট্রেণে তাহার সহযাত্রী হইল একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। বৃদ্ধটি অতি সুপুরুষ; দোহারা লম্বা চেহারা, গৌর বর্ণ, দীর্ঘ শুভ্র চুল বড় বড় স্তবকে সমস্ত মাথাটির চারিদিক বেড়িয়া দেবতার মাথার জটার ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছে, দাড়ি-গোঁপ কামানো; তাঁহার মুখে এমন একটি স্নিগ্ধ করুণ অমায়িক ভাব মাখানো আছে যে, তাহা সহজেই লোককে আকৃষ্ট করে। তাঁহার বেশভূষা সাদাসিধা, কিন্তু পরিপাটি; সোনার ডিবে হইতে মধ্যে মধ্যে নস্য লইয়া একখানি রেশমী রুমালে তিনি হাত ঝাড়িয়া ফেলিতেছেন। বিমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা, তুমি কোথায় যাবে?

বিমল অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আজ্ঞে, আমার যাবার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। আমি পথিক, পথে-পথেই ঘুরে বেড়াই।

বৃদ্ধের চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; মুখের হাসিটি করুণ হইয়া গেল, কণ্ঠের স্বর বেদনায় আর্দ্র হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ বলিলেন—বাবা,

ভগবান এর মধ্যেই তোমায় পথে বা'র করেছেন। তোমার যে বাবা বড় কচি বয়েস।

বিমল অপ্রস্তুত হইয়া কুণ্ঠিত ম্লান মুখ নত করিল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—বেশ হ'ল বাবা, তোমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল। আমিও ঐ তোমারই মতন বয়েস থেকে পথে বেরিয়েছি, পথের শেষ পেলাম না বাবা, পরমায়ু কিন্তু শেষ হয়ে এল! আমার দিনের শেষে তোমায় আমার পথের সঙ্গী পেলাম; আমার একটি ভার তোমায় দিয়ে যাব, তোমায় নিতে হবে বাবা!

বৃদ্ধ উঠিয়া আসিয়া দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন—তাঁহার চোখ মিনতিতে সজল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই স্বল্প পরিচয়েই বৃদ্ধ এমন আত্মীয়ভাবে বিমলকে কি অনুরোধ করিবেন বুঝিতে না পারিয়া বিমল অতিশয় আশ্চর্য, উৎসুক ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—বলুন, সাধ্য হলে আপনার ভার আমি গ্রহণ করব।

বৃদ্ধ শিথিল হইয়া বিমলের পাশে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া রেশমী রুমালে চোখের জল মুছিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—বাবা, তোমারই মতন বয়সে আমি সর্বস্ব খুইয়ে পথে বেরিয়েছিলাম; নিজের হাতে আমার সর্বস্ব যার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, শুনেছি সে তাকে অনাদর ক'রে ধুলোয় ফেলে চলে গেছে! আমি সেই হারানো রত্ন পথে-পথে খুঁজে বেড়াচ্ছি! খুঁজে পাইনি আজও, দিন কিন্তু ফুরিয়ে এল! আমার এই কাজটি তোমায় নিতে হবে।

বৃদ্ধ আবার বিমলের দুই হাত আবেগভরে দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন। বিমল বৃদ্ধের কথা স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বৃদ্ধের

দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন—বাবা, পথের নেশা তোমার কেন লেগেছে? তুমিও কি কোন রত্ন এই পথের ধুলোয় খুইয়েছ?

বৃদ্ধের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জিত হইয়া বিমল মুখ নত করিল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—যাক্ বাবা, আমি তোমার গোপন কথা শুন্‌তে চাইনে; এইটুকু শুধু জান্‌তে চেয়েছিলাম যে পথে-পথে ঘুরে মর্‌বার তোমার টান কতটুকু। এখন আমার কথা বলি শোন—তারপর আমার কথা শুনে তোমার আমাকে বিশ্বাস আর ইচ্ছে হয় তোমার কথা শুন্‌ব।

বৃদ্ধ জামার বুক-পকেটের মধ্যে হাত ভরিয়া একটা মখমলের খাপ বাহির করিলেন। তারপর রেশমী রুমালে বেশ করিয়া দুই হাত ঝড়িয়া মখমলের খাপ খুলিয়া বাহির করিলেন হাতীর দাঁতের উপর নানান্ রঙে আঁকা একটি সুন্দরী তরুণীর ছবি!

সেই ছবি দেখিবামাত্রই বিমল ব্যস্ত হইয়া বৃদ্ধের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে কান্না-ভাঙা স্বরে বলিয়া উঠিল—একে যে আমি চিনি! একেই যে আমি পথে-পথে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছি! এর ছবি আপনি কোথায় পেলেন? এ কে? এর নাম কি? এ এখন কোথায় আছে?

বৃদ্ধ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—এ এখন কোথায় আছে তাই জানবার জন্যেই ত' আমি পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে মৃত্যুর দরজায় এসে পৌঁছলুম, তবু ত' সন্ধান পেলুম না। একেই তুমিও খুঁজে বেড়াচ্ছ? ভুল করছ বাবা, তুমি ভুল করছ—এখন ত' সে আর এমন তরুণী নেই, সে এতদিনে আমারই মত স্থবির, আমারই মতন পলিতকেশ বৃদ্ধা হয়ে গেছে। তবু এই ছবির রূপের অন্তরাগ যেটুকু তার

অঙ্গে এখনো আছে, তাই দেখেই তাকে চিন্‌তে পার্‌বে ব'লে তার এই ত্রিশ বৎসর আগেকার এই ছবি তোমাকে দেখালুম।

বিমল হতাশ হইয়া বলিল—ত্রিশ বৎসর আগেকার ছবি! তা হবে! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এই ছবি যার নকল আমি তাকে ছু'বৎস আগে এমনি রূপেই দেখেছি! হয় ত' আমার ভুল হয়েছে! আমি ত' তার মুখ দেখিনি, আমি ত' তাকে চিনি না—তবু যে আমি তাকে খুব চিনি!

বিমলের অসম্বদ্ধ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অল্পক্ষণ অবাক্ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—বাবা, তুমি কি বল্‌ছ, আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না; এখন আমি বুঝতেও চাই না। আগে আমার কথা শোন। এ যার ছবি, সে ত্রিশ বৎস আগে এমনি তরুণী ছিল, এখন নেই। এক প্রদীপ থেকে জ্বালা আর-এক প্রদীপের মতন এমন উজ্জ্বল, এমনই সুন্দর রূপশিখা তুমি যে দেখেছ, সে এরই মেয়ে হয়ত! আমি বৃদ্ধ, আমি অতীত; তুমি যুবা, তুমি বর্তমান; এই ছবির অতীত মূর্তি যদি বর্তমানে আবার আকার পেয়ে থাকে সে খোঁজ তুমি নিজের গরজেই কর্‌বে! অতীত আমার ভার বর্তমান তোমাকে নিজের গরজে বাধ্য হয়েই যখন বইতে হবে তখন অসঙ্কোচে আনন্দিত মনেই আমি তোমার হাতে আমার অসমাপ্ত কাজ তুলে দিচ্ছি। আমার যা বিষয়-সম্পত্তি আছে, তার দাম প্রায় দশ লক্ষ টাকা হবে; এই বিষয়েরও ট্রাষ্টি হবে তুমি; যদি এই ছবির লোকটিকে জীবন্ত পাওয়া যায়, কি তার কোন সন্তান থাকে, তবে এই সম্পত্তি তুমি তাকে বুঝিয়ে দেবে;—তোমাকে আমি কিছু দেব না; অর্থের লোভ দেখিয়ে আমি তোমাকে অপমান করব না; কেবল তাদের সন্ধানের জন্য তোমার ভ্রমণের

পাথের ব'লে তুমি মোটের উপর দশ হাজার টাকা নেবে। যদি তাদের সন্ধান আর দশ বছরেও না পাওয়া যায়, তবে তুমি আর তোমার নির্বাচিত আর একজন ট্রাষ্টি দু'জনে মিলে রমণীর শিক্ষা প্রভৃতি তাদের সকল রকম সুখ-সুবিধার সাহায্যে ঐ দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করবার ব্যবস্থা করবে।

বৃদ্ধ বিমলের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ছবির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি নীরব নিস্পন্দ বিমলকে একটা নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া বলিলেন —কেমন বাবা, রাজি ?

বিমল উদাস দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রাজি।

—তবে আমার ইতিহাসটা শোন—বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহার জীবন-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা লক্ষ্ণৌ শহরের প্রবাসী। অবস্থায় শিক্ষায় সহবতে আমরা সে দেশের রইস ছিলাম। আমি লেখাপড়া কর্‌তাম আগ্রায় আমার এক কাকার বাড়ীতে থেকে। কিছুদিন পরে কাকিমার ভাই মারা গেলেন, তাঁদের আর কেউ ছিল না ব'লে খুড়িমা তার ভাইঝিকে নিজের কাছে আনিয়ে নিলেন—তার নাম লীলা।

আমরা পশ্চিমে-বাঙালী কাঠ-খোট্টা—রস-কসের ধার বড় ধারতাম না; মোটা মোটা কড়া রুটি খেতাম আর কুস্তি ক'রে মুগুর ভেঁজে দেহটাকে কড়া করতাম, মনটাও পাথরের মতনই কঠিন ছিল। প্রবাদ আছে যে চন্দ্রকান্তমণি কঠিন শিলা বটে, কিন্তু চাঁদের আলো লাগলে সেও গলে জল হয়ে যায়। লীলার চাঁদের মতন সুন্দর চোখ দুটির দৃষ্টির জ্যোৎস্না লেগে আমার হৃদয়শিলা গলে উঠল। আমার বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ আর লীলার বয়স সতের-আঠারো।

এই সেই লীলার ছবি। লক্ষ্ণৌএর পটু পটুয়ার কাছে শেখা আমার চিত্রবিদ্যা কাজে লেগে গেল; এক চুলের তুলি দিয়ে এক বছর ধ'রে এই ছবিখানি আমি এঁকেছিলাম! তখন কি জানি যে এই ছবির ছায়াই আমার সার হবে? ভাগ্যে তখন এই ছবিখানি এঁকে রেখেছিলাম! নইলে আমার আজ সম্বল কি থাক্‌ত? এই ফিরোজী রঙের ওড়নাখানি সে এমনি ক'রেই ঘুরিয়ে ঘোমটা দিত; তার মুখে যখন এই হাসিটি খেলে যেত, মনে হ'ত স্বর্গের তোরণ-দ্বার মুক্ত ক'রে সুখের ডালি হাতে নিয়ে সোনার পরী মর্ত্যে নেমে এল!

এই যে আমার প্রণয়, সে যেন ছিল কণ্টকহীন কমল। আমাদের বাঙালী-সমাজের যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ প্রণয়ীদের দূর ক'রে রাখে, জীবনকে ভয়ে ভাবনায় দুর্বহ ক'রে তোলে, ছল-চাতুরীর শরণ নিতে বাধ্য করে, আমাদের সে-সব বালাই ছিল না। আমরা এক-বাড়ীতে অষ্টপ্রহর এক-সঙ্গে থাক্‌তে পেতাম; আমার লীলার প্রতি টান খুড়িমার কাছে লুকানো যেত না; কিন্তু তাতে খুড়িমা বিরক্ত না হয়ে খুশীই হতেন মনে হ'ত; আমার ল'-এগজামিনটা হয়ে গেলেই আমার সঙ্গে লীলার বিয়ে হবে, এই ব্যবস্থাটা আমাদের সকলের মনেই না বলা-কওয়া ক'রেই কেমন কায়েমি রকম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের প্রণয় শতদল আনন্দের রশ্মিপাতে দিনে দিনে দলের পর দল মেলে বিকশিত হয়ে উঠছিল; উভয়ের জীবনের উপর থেকে অপরিচয়ের আবরণ একটার পর একটা যেন ঘুচে যাচ্ছিল!

বিমল মাঝখানে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—কিন্তু এই কি ঠিক? প্রেমের আলো হৃদয়ে যদি জ্বলে ওঠে, তবে এক মুহূর্তে

যে পরিচয় হয়, সে যে যুগ-যুগান্তের ক্রমশ-পরিচয়েরও বাড়া! প্রণয়ীদের মিলনের পথে বাধা—সে যেন ঘরে আগুন লাগলে দেয়ালের বাধার মতন, আগুন যখন প্রবল হয়ে দেয়াল টপ্‌কাতে পারে তখন একেবারে যে শিখার প্লাবনে সমস্ত অকস্মাৎ ছেয়ে ফেলে! আপনার চেয়ে এ বিষয়ে আমার ভাগ্য ভাল! আমি তাকে ক্ষণিকের বেশী কাছে পাইনি, আমি তার ঘোমটা-খোলা মুখ দেখিনি, তবু আমি তাকে চিনি, তবু তাকে আমি ভালোবাসি!

বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে বলিলেন—তুমি যা বল্‌ছ বাবা, তা ঠিক—অমন মিলনের একটি মুহূর্ত স্বর্গের আলোতেই উদ্ভাসিত, কিন্তু প্রায়ই তার পিছনে একটা মিথ্যা মায়া, একটা কল্পনা জড়িয়ে থাকে।······থাক্ সে কথা, এখন আগে আমার কথাটাই শেষ করি। আমাকে বাধা দেবার কিছু বা কেউ না থাক্‌লেও আমার প্রণয় বেগেই প্রবাহিত হচ্ছিল। লীলার চোখে যে শিখা জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌ত, তার আগুনে আমার হৃদয় তপ্ত হয়ে ধরে উঠেছিল; আমি তার কানে যে-সব প্রণয়বাণী গুঞ্জন করতাম, তাতে তার নয়নের শিখা উজ্জ্বলতর হয়েই উঠত! কিন্তু হায়, তখন কে জানত যে বিধাতা মানুষের হাতে সুখের খেলনা দিয়ে, কাঁদিয়ে আবার ছিনিয়ে নিয়ে নিষ্ঠুর হয়ে মজা দেখে।

এই সময় একটি বাঙালী যুবক হাওয়া বদল কর্‌তে আগ্রায় এসে বাস কর্‌তে লাগল। সে একদিন যেচে এসে আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌লে—বিদেশে এসে একলা আছে, বাঙালীর সঙ্গ না পেয়ে হাঁপিয়ে উঠছে, অন্য সব বাঙালীরা নামেই বাঙালী, বাংলার তারা ধার ধারে না, আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে সে খুব খুশী হয়েছে, আমি যদি দয়া ক'রে মাঝে মাঝে তার বাসায় পায়ের ধুলো দিই, তা হলে সে বেচারা বেঁচে যায়;—এমনি সব অনেক কথা ব'লে আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে গেল।

দু'জনের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠল। তখন আমিও তাকে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে লাগলাম। ক্রমে আমাদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গেও তার পরিচয় হ'য়ে গেল—আমার প্রেয়সী ভাবী পত্নী ব'লে লীলার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমাদের বাড়ীতে এখন তার অবারিত গতি।

এই বাবুটির নাম ললিত বক্সী—সুন্দর সুশ্রী, গাল দু'টিতে গোলাপের আভা; সাজে সজ্জায় ফিট্‌ফাট, শুনলাম জমিদার—আমাদেরই স্ব-জাত স্ব-ঘর।

ললিত বড় ঘন ঘন লীলার কাছে আস্‌তে শুরু করলে। আমার মনটা একটু হিংসায় জ্বলে উঠল। কিন্তু আর-একটি বিবাহযোগ্য সুপাত্রের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখেই যেন লীলা আমার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে উঠল, আমার ওপর তার অন্তরের টান ছুতায়-নাতায় বেশী ক'রেই প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু লীলা আগে সন্ধ্যা হলে যখন বাগানে বেড়াতে যেত আমায় ডাকত, আজকাল আর ডাকে না; একলা বাগানে গিয়ে অনেক রাত্রি ক'রে বাড়ীতে ফেরে; কোনো দিন আমি সঙ্গে গেলে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে—সমস্ত দিন বাড়ীতে বসে থাক্‌লে অসুখ করবে; বাইরে ঘোড়ায় চড়ে খানিক বেড়িয়ে আসা ভাল ব'লে আমায় চলে যেতে তাগাদা করে, আমি না শুনলে কিংবা দেরী করলে তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাড়ীতে ফেরে, বাগানে আর থাকে না।

সন্ধ্যাবেলা ললিতের বাড়ীতে গেলেও ললিত ব্যস্ত হয়ে পড়ে; আমাকে সন্ধ্যাবেলা ঘরে থাক্‌তে নিষেধ করে, বেড়াতে যেতে বলে; তার শরীর অসুস্থ, হিম লাগ্‌বে ব'লে সে কিন্তু বাইরে বেরুতে চায় না।

অবশ্য তখন আমি এর মধ্যে কোন মতলব সন্দেহ করিনি, পরে সব বুঝতে পার্‌লাম।

একদিন বেড়িয়ে সকাল সকাল বাড়ী ফিরেছি। খুড়িমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—লীলা কোথায়? খুড়িমা বল্‌লেন—লীলার মাথা ধরেছে, তাই সে এখনো বাগানে আছে।

লীলার মাথা ধরেছে শুনে আমার মন ব্যস্ত হয়ে উঠল, আমি ছুটে বাগানে গেলাম; বাগান অন্ধকার, কোথায় লীলা? জোরে ডাক্‌লাম—লীলা।—জবাব পেলাম না। এদিক-ওদিক ক'রে কেয়ারির ফাঁকে ফাঁকে ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে ডাক্‌তে লাগ্‌লাম—লীলা! লীলা! সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে একটা লোক দৌড়ে গিয়ে লতাকুঞ্জের পাশে লুকালো। আমি তার দিকে দৌড়ে যেতে যেতে বল্‌লাম—এ কি দুষ্টামি তোমার লীলা? এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে তোমার লুকোচুরি খেলা!

এমন সময় আমার পিছন থেকে লীলার ভয়-চকিত শ্বাস-রুদ্ধ ডাক শুন্‌তে পেলাম—তুমি আমায় ডাক্‌ছ? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমি যে এই মার্বেলের বেদীতে শুয়ে আছি!

আমি থম্‌কে দাঁড়ালাম। লীলা যদি আমার পিছনে মার্বেলের বেদীতে শুয়ে আছে, তবে আমার সাম্‌নে দিয়ে পালালো ও কে? চোর।

আমি লীলাকে বল্‌লাম—লীলা, তুমি বাড়ীতে পালাও, বাগানে চোর ঢুকেছে! ভাগ্যিস্ আমি এসে পড়েছি, নইলে ঘুমন্ত তোমার সব গহনা চুরি ক'রে নিয়ে যেত। আমি ওকে এক্ষণি ধরে ফেল্‌ছি।

লীলা অত্যন্ত ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—না না, তুমি একলা চোরের কাছে যেওনা, পালিয়ে এস, লক্ষ্মীটি পালিয়ে এস!

আমি আবার থম্‌কে দাঁড়ালাম ; চোরটা তাই দেখে ছুটে বাগানের খিড়্‌কি দরজার দিকে গেল। চোরটা পালায় দেখে আমি লীলার নিষেধ গ্রাহ্য না ক'রেই তিন লাফে গিয়ে চোরটার গলা টিপে ধর্‌লাম—আমরা পশ্চিমে-বাঙালী, চিরকাল কুস্তি-কসরৎ ক'রে এসেছি, একটা চোরকে কাবু কর্‌ব তার আবার কথা কি! আমার কোমর-বন্দে ছোরা ছিল, ছোরাখানা টেনে উঁচিয়ে বল্‌লাম—খবরদার!

চোরটা রিভলভার বার ক'রে বল্‌লে—হুঁসিয়ার!

আমি চোরটাকে ছেড়ে দিয়ে এক লাফে পিছিয়ে এলাম, সোজা হ'তেই আমি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম—এ কি! ললিত তুমি!

আমাদের উদ্যত অস্ত্রের মাঝখানে লীলা ছুটে এসে দাঁড়িয়ে আমায় বল্‌লে—অমৃত, অমৃত, আমাকে চিরদুঃখিনী কোরো না। ইনি আমার স্বামী, ছেলেবেলা থেকে আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালো-বাসি ; বাবা মারা যেতে পিসিমা আমায় নিয়ে এলেন, বুঝলাম তাঁর ইচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়—তাই আমি মিথ্যে ভান ক'রে এতদিন তোমার মন ভুলিয়ে এসেছি, শুধু সুযোগের অপেক্ষায়। আমিই চিঠি লিখে ললিতকে এখানে আনিয়েছি। ললিত আমাদের জাত নয়, সমাজে আমাদের মিলন হবার নয়, আমরা ঠিক করে-ছিলাম কাল্‌কে আমরা পালিয়ে যাব। আজকে তুমি আমার জীবনের সকল সুখের বুকে ছুরি মেরো না।

লীলা লজ্জায় ভয়ে দুঃখে থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে ফেল্‌লে। আমি অবাক হয়ে ললিতের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

লীলা মুখ তুলে ক্ষীণ কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি হবে অমৃত?

আমি লীলার কথার উত্তরে স্থিরকণ্ঠে ললিতকে বল্‌লাম—দেশ যাবার সমস্ত উদ্যোগ ক'রে কাল এমনি সময় এসো।

ললিত চোরের মতন রিভলবারটি বুকে লুকিয়ে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি নিজের হাতে যে রিভলভার নিজের বুকে দাগ্‌লাম, তার কাছে ললিতের রিভলভার কুণ্ঠিত হয়ে ফিরে গেল।

লীলা উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে শুধু বল্‌তে লাগল—অমৃত, অমৃত, আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর।

আমি কোন কথা বল্‌তে পার্‌লাম না। কী বল্‌ব? নীরবে লীলাকে ধরে নিয়ে এসে বেদীতে বসিয়ে রেখে আমি বাড়ীতে ফিরে এলাম। খুড়িমা জিজ্ঞেস ক'র্‌লেন—লীলা এল না?

আমি বল্‌লাম—আস্‌ছে।

খুড়িমা বলে উঠলেন—অমর্ত্ত, তোমার কি অসুখ করেছে?

—হ্যাঁ, আমি আজ আর কিছু খাব না—ব'লে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিলাম। তখন আমার হৃদয়ের খিল খুলে দুঃখের বন্যা অশ্রুস্রোতে ছুটে বেরিয়ে পড়্‌ল।

তার পরদিন সন্ধ্যাকালে আমি যেমন বেড়াতে বেরুই, তেমনি বেড়াতে বেরুলাম। লীলার জিনিসপত্র যা তার সঙ্গে নেবার তা দিনের বেলাই আমি গোপনে ললিতের বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বাড়ীতে লীলার সঙ্গে আর দেখা করতে পর্‌লাম না। সন্ধ্যা ঘন হয়ে এলে বাগানের খিড়্‌কি দরজার বাইরে এসে দেখ্‌লাম, একখানা এক্কায় ললিত আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। আমি বল্‌লাম—যাও নিয়ে এস।

কাপুরুষটা একটু থতমত খেয়ে বললে—তুমিই যাও।

আমি এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে দরজায় টোকা মারলাম।

লীলা দরজা খুলে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে—কে, ললিত?

আমি বললাম—না, আমি অমৃত।

লীলা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। তার দোষ নেই; আমি যে আমার এত বড় ভীষণ সর্বনাশ করতে বসেছি তা সে তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না, আমিও তখন বুঝতে পরিনি যে আমার আত্মবলি কত কঠিন, কিন্তু কি সহজে আমি সম্পন্ন করছি।

আমি বললাম—লীলা, এস, ললিত তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

লীলা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি লীলার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেলাম। লীলা ললিতকে দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে; সে তখনো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, সে যেন আমার কাছ থেকে পালিয়ে ললিতের আশ্রয় নিয়ে বাঁচল। আমি এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। এক্কার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে গেলাম।

ট্রেণ ছেড়ে দিলে। লীলা চোখের জলের ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাত দু'খানি জোড় ক'রে বড় মিনতি জানিয়ে ব'লে গেল—ভুলে যেয়ো, আমায় ক্ষমা কোরো।

আমি সর্বস্ব নিজের হাতে পরকে বিলিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

বিমল বৃদ্ধের বেদনায় আহত হইয়া চোখ মুছিয়া বলিল—এমন ক'রে নিজের হাতে হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল ক'রে দেওয়া বড় কঠিন, বড় ভয়ানক! আপনি অসাধ্য-সাধন করেছেন, অমৃতবাবু!

অমৃতবাবু কাতরভাবে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—অসাধ্য কি কখনো সাধন করা যায় বাবা! লীলাকে আমি অতিশয় ভালবেসেছিলাম ব'লেই আমি তাকে সুখী কর্‌বার জন্যে নিজের সুখ বলি দেওয়া আমার সাধ্য হয়েছিল!

বিমল জিজ্ঞাসা করল—তারপর কি হ'ল! আপনার খুড়িমা জেনে কি কর্‌লেন?

অমৃতবাবু গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরে দেখিতেছিলেন, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—খুড়িমা যখন জান্‌লেন যে, লীলা বাড়ীতে নেই, তখন গভীর রাত্রি। আসল ব্যাপার না জানায় ভুল দিকেই খোঁজ হতে লাগ্‌ল; তার পরদিন যখন জানা গেল যে ললিতও নেই, তখন তাঁরা ব্যাপার কতকটা অনুমান কর্‌তে পার্‌লেন; আর আমিই যে ললিতকে বাড়ীতে এনে এই সর্বনাশটা ঘটালাম তার জন্যে আমাকেই দোষী কর্‌তে লাগ্‌লেন। আমি নীরবে সমস্ত সহ্য ক'রে রইলাম। আমাদের কলঙ্কে আগ্রা ভরে উঠ্‌ল। কাকা চেষ্টা ক'রে বদলি হয়ে একেবারে রাওলপিণ্ডি চলে গেলেন; আমি ল'পাশ ক'রে রেঙ্গুন চলে গেলাম। রেঙ্গুনে এডভোকেট হয়ে অনেক টাকা উপার্জন করেছি, সেইদিকে ঝোঁক দিয়েই লীলাকে ভুল্‌তে চেয়েছি; লীলা জমিদারের গৃহলক্ষ্মী হয়ে সুখে আছে মনে ক'রে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করেছি। মৃত্যুর পূর্বে একবার লীলাকে দেখে মর্‌বার ইচ্ছা হ'ল; আমার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ তারই নামে দেশের কোন কাজে ব্যয় কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ব বলে দেশে ফিরে এলাম। এসে শুন্‌লাম আগ্রা থেকে আসার বছর দুই পরেই ললিত লীলাকে ত্যাগ করেছিল; ললিত কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল, লীলা তা প্রত্যাখ্যান ক'রে এক কাপড়েই

ললিতের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে। ললিতও গেল-বছর মারা গেছে। লীলা কোথায়, বেঁচে আছে না মরে গেছে, কেউ জানে না। আমি সেই অপমানিতা প্রতারিতা প্রত্যাখ্যাতা লীলাকে খুঁজে খুঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কালের অমৃত-প্রলেপে হৃদয়ের যে ক্ষত আবৃতমুখ হয়ে এসেছিল তা আবার বিদীর্ণ হয়ে গেছে; মনের মধ্যে যে শোণিতস্রাব হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আর বেশী দিন বাঁচব না। তাই আমার অনুরোধ, আমার এই ভারটি তোমায় নিতে হবে বাবা। কিন্তু বাবা, আমার মতন বুড়ো মানুষের কৌতূহল প্রকাশ করা শোভা পায় না, তবু কেন যে তুমি এই ছবি দেখে অমন ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র আমাদের দুজনকে ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলছে জানাতে কি তোমার আপত্তি আছে?

বিমল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া নম্রস্বরে বলিল—আপনি অসঙ্কোচে আপনার জীবনের ইতিহাস আমাকে বল্‌লেন; আপনার কাছে আমার কিছু গোপন করা উচিত নয়; গোপন করবারও কিছু নেই, বল্‌বারও বেশী কিছু নেই। এক কথাতেই শেষ হয়ে যাবে—

এমন সময়ে ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে থামিল। একখানা টেলিগ্রাম আনিয়া ষ্টেশনের লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ গাড়ীতে অমৃতবাবু বলে কেউ আছেন কি?

অমৃতবাবু আপনার পরিচয় দিয়া সেই টেলিগ্রাম লইলেন। টেলিগ্রাম পড়িয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—বাবা বিমল, আমার বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী করবার ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলাম, আমার এজেণ্ট টেলিগ্রাম করেছে, আমাকে তুরন্ত রেঙ্গুনে যেতে হবে। আমি এই ষ্টেশনেই নামলাম; পরের ট্রেনেই কলকাতা ফির্‌ব। এই রইল

আমার নাম-ঠিকানা-লেখা কার্ড। আর রইল তোমার ওপর লীলাকে খোঁজার ভার। যদি সন্ধান পাও টেলিগ্রাম কোরো। আমি যত শিগ্‌গির পারি ফিরে এসে তোমার কাহিনী শুনব—ঈশ্বর করুন, যাকে খুঁজছ তার আর তোমার দু'জনের হাসিমুখ থেকেই শুন্‌ব।

অমৃতবাবু গাড়ী হইতে মোটমাটরি লইয়া নামিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বিমল এই অল্প পরিচয়ের বৃদ্ধ সঙ্গীটিকে হারাইয়া অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িল। তাহার কোলে হাতীর দাঁতের উপর আঁকা লীলার ছবিখানি আর বৃদ্ধের নাম-ঠিকানা-লেখা কার্ড পড়িয়া না থাকিলে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত—সমস্ত ঘটনাটা এমনই আকস্মিক।

একাকী ভ্রমণ করিতে বিমলের আর ভালো লাগিতেছিল না। সেও কিছু দূর গিয়াই, বাংলা দেশে ফিরিয়া চলিল—স্থির করিল তাহার সহপাঠী বন্ধু সোনাতলার জমিদার রাজা ফণীন্দ্রনাথ নাগের কাছে গিয়া কিছু দিন থাকিবে।

রাজা ফণীন্দ্রনাথ নাগ বিমলের সহপাঠী ; একসঙ্গে থাকিতে থাকিতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু উভয়ের স্বভাব ও মনের ছাঁচ একেবারে উল্টা রকমের। ফণী একটু কাটখোট্টা ধরণের কর্কশ অভব্য লোক ; সে কাব্য চিত্র প্রভৃতি সুকুমার সামগ্রী দুচক্ষে দেখিতে পারিত না—সে কাজের লোক, স্বপ্নবিলাসী নয় বলিয়া গর্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া নীরস জিনিসেরই পক্ষপাতী সাজিত। সে জমিদার হইয়া জন্মিয়াছে, তাহার কাব্যকলা লইয়া থাকিলে ত' চলিবে না, তাহাকে কাজের লোক হইতে হইবে। যাহাদের হাতে-কলমে শিখিবার ক্ষেত্রের অভাব, তাহারা কেতাব ঘাঁটিয়া পরের কথা মুখস্থ করিয়া মরুক, তাহাকে শিখিবার জন্য পরের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হইবে না—মানব-চরিত্র ও কাজের শৃঙ্খলা নখদর্পণে জানিয়া লইয়াই তাহার জমিদারের ঘরে জন্ম হইয়াছে। এই আত্মম্ভরিতা তাহার মন ভরিয়া রাখিয়াছিল ; সে আপনাকে পরম বিজ্ঞ ঠাওরাইয়া যখন-তখন যাকে-তাকে শুনুক-না-শুনুক উপদেশ দিতে সদা প্রস্তুত। সে যাহা বুঝে তাহাই ঠিক, এই ধারণার জন্য সে নিজের বাড়ীতে ও জমিদারীতে একটি স্বেচ্ছাচারী উপদ্রব হইয়া উঠিয়াছিল এবং যাহারা তাহাকে মুরুব্বি বলিয়া না মানিতে পারিত, তাহাদের সহিত তাহার বনিত না। তাহার রসিকতা, কথাবার্তা, চালচলন এমন মোটা ও ভোঁতা রকমের যে তাহা মার্জিত ভদ্ররুচির

লোকের কাছে অসহ্য। বিমল শান্তপ্রকৃতির লোক বলিয়া এই লোকটির বর্বর আত্মম্ভরিতায় আহত না হইয়া কৌতুক অনুভব করিত। ফণীর মুখে "আমি ত'—এ আগেই ব'লে রেখেছিলাম" লাগিয়াই আছে। যে ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা সে কস্মিন্‌কালে স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাও ঘটিতে দেখিলে সে অমনি বিমলের হাত ধরিয়া আনন্দ-উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিত—"কেমন হে, এমন যে হবে আমি ত' এ একমাস আগেই ব'লে রেখেছিলাম। তুমি যদি তখন আমার পরামর্শ শুনে চল্‌তে!" বিমল তাহার এই আত্মগৌরব-ঘোষণা সহ্য করিয়া নীরবে হাসিত এবং ফণীও বিমলকে লম্বা বক্তৃতা দিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিত। কেহ যদি তাহার চোখে আঙুল দিয়া নজির ও দলিলের সাক্ষীতে জাজ্বল্যমান প্রমাণ করিয়া দেখাইত যে ফণী এখন যাহা বলিতেছে পূর্বে ঠিক ইহার উল্টাটাই বলিয়াছিল, তবে সে ভয়ানক চটিয়া যাইত এবং সে-রকম অভদ্র মিথ্যাবাদী লোকের সঙ্গে যে কোনো ভদ্রলোকেরই সম্পর্ক রাখা উচিত নয় ইহা সে মুখ অন্ধকার করিয়া বারবার বিমলকে শুনাইত। বিমলের মতন এমন নীরব সায় আর কাহারও কাছে পাইত না বলিয়া বিমল তাহার একমাত্র বন্ধু যে শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। তাহার কথায় সায় দিবার লোক আরো অনেক ছিল, কিন্তু তাহারা হয় তাহার জমিদারী-সেরেস্তার আমলা, নয় বাড়ীর চাকর, নয় জমিদারীর প্রজা—তাহারা প্রাণের দায়ে দুর্দান্ত হুজুরের রায়ে সায় দিয়া চলিত। কিন্তু সমকক্ষ লোক প্রসাদের আকাঙ্ক্ষা রাখে না, অথচ তাহার কথা মানিয়া লয়, সে একমাত্র বিমল—তাই বিমল তাহার প্রাণের বন্ধু।

বিমলের ন্যায় নব্যতন্ত্রের সর্বসংস্কার-বর্জিত স্বাধীন-মতের লোকের সঙ্গে থাকিয়া ফণীর কিন্তু যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। যে

কাজের লোক, কাজের সুবিধা হয় দেখিয়া সে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা, বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়া এবং অবরোধ-প্রথা রহিত করার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু সেই উদার মতটির মধ্যে তাহার একটু জমিদারী চালের প্রতিপ্রসব ছিল। সে বলিত—হাঁ, বড় বয়সের লেখাপড়া কাজকর্ম জানা মেয়েকেই বিবাহ করা উচিত বটে, এবং বিবাহের পর তাহাকে সকল পুরুষের সম্মুখে অবাধে বাহির করাও যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সর্বদা কড়া শাসনে রাখিতে হইবে। তেজী ঘোড়া ছুটিয়া চলে, অথচ জনতার ভিড়ে কাহারো ঘাড়ে পড়ে না দেখিয়া লোক বিস্ময় মানে ; তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, উহার কারণ ঘোড়ার গুণ নয়, ঘোড়ার উপরে যে বল্গা ধরিয়া বসিয়া আছে তাহার গুণ। মেয়েদের ছাড়িয়া দিতে হইবে, কিন্তু কড়া রাশ টান করিয়া রাখিতে হইবে নিজের হাতে। একটু বল্গা আল্‌গা পাইয়াছে কি ঘোড়ার মত মেয়েদিগকেও বাগ মানানো মুস্কিল হইয়া উঠিবে। ফণী বিমলকে এই উপদেশ দিয়া প্রায়ই বলিত যে,—বিমল যে রকম নম্র প্রকৃতির, সে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিলে একটা কিছু অনর্থ ঘটাইয়া বসিবে ; কিন্তু ফণী বিবাহ করিয়া লেণ্ডারী ত' হইবেই না,—নহিলে দেখাইয়া দিত কেমন করিয়া স্ত্রীকে চালাইতে হয় !

বিমল পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক তরুণী ভিখারিণীর মুখে তাহার অদেখা অচেনা ভালবাসার লোকটির মুখের আদল খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়া ফণীর অহঙ্কারে-সদা-সচেতন 'আমি'-র ধাক্কায় সমস্ত ভাবনা-চিন্তাকে কিছুদিনের জন্য চাপিয়া রাখিতে ফণীর বাড়ীতে যাইতেছিল। বঙ্গের অন্তরদেশে প্রবেশ করিতে করিতে তাহার ভূমির শ্যামলতা, লোকের সরসতা ও জলের বিচিত্রতা দেখিয়া বিমলের মন প্রফুল্ল ভারমুক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। বিমলের

আশা হইতে লাগিল, এই অনুপম সৌন্দর্যের মধ্যে নিরন্তর অবগাহন করিয়া থাকিয়া ফণীর অন্তরের অহঙ্কারের বিষ নিশ্চয় অনেকটা উপশম হইয়া গিয়াছে—এই সরসতার ছোঁয়াচ লাগিয়া তাহার মন সমবেদনার দয়ায় মমতায় নিশ্চয় অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে বোধ হয় এখন আর আপনাকে অভ্রান্ত যা-বুঝি-সব-ঠিক ধরণের লোক বলিয়া মনে করিতে পারে না। বঙ্গদেশের আপন-বিলানো আনন্দ যে নদীর ধারায় অবিরল, পাখীর কণ্ঠে নিরন্তর, পত্রে-পুষ্পে সুপ্রচুর—ইহার মধ্যে কঠিন উগ্রতার ঠাঁই যে নাই! ভারতের দিকে দিকে ছুটাছুটি করিয়া বিমলের মনে শুষ্ক নগ্ন কঠিন দেশের স্পর্শে যে বিরসতা আসিয়াছিল, বঙ্গের সৌন্দর্যে প্রাণ খুলিয়া অবগাহন করিয়া দূর হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় বিমলের পানসী রূপালি নদী দিয়া আসিয়া সোনা-তলার ঘাটে ভিড়িল। ছোট্ট নদীটি, গভীর খরবেগ; ঠিক নদীর উপরেই প্রকাণ্ড সুসজ্জিত সুরক্ষিত বাগানের মধ্যে ফণীর ছবির মত সুন্দর সদ্য-চুনকাম-করা বাড়ীখানি। বাগানের ছাঁটা ঘাসের চৌরস ক্ষেত নদীর ঢালু পাড়ের উপর দিয়া একেবারে জলের কিনারা পর্যন্ত বিস্তৃত, যেন একখানা সবুজ বনাতের বড় ফরাস ছড়াইয়া পাতা হইয়াছে। সেই ঘাসের ক্ষেতের মাঝে মাঝে ফুলের কেয়ারি, পাতা-বাহারের ঝোপ, লাল কাঁকরফেলা সরু পথের দুধারে এক এক রকম গাছের সারি। সেই বাগানে পথের কত বক্রতা, ঝোপের কত নিবিড়তা, ফুলের কেয়ারীর কত জটিলতা, তরুবীথির কত বিচিত্রতা সন্ধ্যার আলোয় মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল। বিমল উজ্জ্বল মুখে পানসী হইতে লাফাইয়া ডাঙায় নামিল; নৌকা ভিড়িতে দেখিয়া একজন চাপরাসী দৌড়িয়া আসিল। রাজাবাবু বাগানে আছেন,

চাপরাসী তাঁহাকে এত্তেলা দিতেছে, তাঁহার মর্জি হইলে সাক্ষাৎ ঘটিতেও পারে।

চাপরাসী এত্তেলা দিতে যাইতেছিল। বিমল বলিল—এত্তেলা দিবার দরকার নাই, রাজাবাবু তাহার দোস্ত, বিনা এত্তেলায় যাইলেও রাজাবাবু গোসা হইবেন না।

চাপরাসী বিমলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বিমল একটু আগাইয়া গিয়া পথের একটা মোড় ফিরিতেই একটা ঝোপের ওপার হইতে ফণীর গলা শুনিতে পাইল। ফণী মালী খাটাইতেছে এবং তিরস্কার করিতেছে—আঃ বুড়ো মেড়া, মরবার বয়স হ'ল তবু বুদ্ধি হ'ল না? গাছের ডাল বুঝি এমনি ক'রে ছাঁটে? বল্লে ত' কথা শুনবিনি—মনে করিস্ মালীর কাজ কর্‌তে কর্‌তে বুড়ো হয়ে গেলাম আমি আর কার কথা শুন্‌ব! ওরে বুড়ো হলেই কি বুদ্ধি হয়? দেখত গাছটাকে একেবারে মুড়ো ক'রে ফেলেছিস—আহাম্মক বুড়ো শূয়ার কাঁহাকা!

বিমল কাছে যাইতেই ফণী চট্ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রূঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল—কে? কে আপনি? আপনি ত' ভারী বে-আদব, এত্তেলা না দিয়ে একেবারে অন্দরের বাগানে এসে উপস্থিত হয়েছেন! কি চাই আপনার?······চাপরাসী!

চাপরাসী ভয় পাইয়া 'হুজুর' বলিয়া সাড়া দিয়া ছুটিয়া সম্মুখে আসিল।

বিমল হাসিতে হাসিতে বলিল—ফণী, তোমার আবার সদর অন্দর কি হে? আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ না?

আরে বিমল নাকি! বলিয়া ফণী হাসিমুখে তাড়াতাড়ি আগাইয়া

আসিয়া বিমলের হাত চাপিয়া ধরিল। "তুমি? তুমি কোত্থেকে, কখন এলে? তোমাকে কি আর চেন্‌বার জো আছে—কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তোমার! চোখ বসে গেছে,—ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, রোগা হয়ে গেছ! ব্যাপার কি হে? নিশ্চয় পড়ে পড়ে এমন দশা করেছ। আমার কথা ত' তুমি শুন্‌বে না, আমি কত বার তোমায় বলেছি কেবল লেখাপড়া কর্‌লে শরীর থাকে না।

বিমল হাসিয়া বলিল—কিন্তু বন্ধু, তুমি ত' আমাকে বরাবর বলে এসেছ যে এক লেখাপড়াই তোমায় দিয়ে হবে, তুমি আর কোন কর্ম্মের নও।

ফণী উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—ছ্যাঃ! তোমার এমন ভুলো মন, একটা কথা মনে রাখ্‌তে পার না। আমি ত' পয়পয় ক'রে তোমায় বলেছিলাম—

বিমল তাহার সমস্ত কথা না শুনিয়া বলিল—হ্যাঁ, তুমি তাও বলেছিলে বটে, এখন স্মরণ হচ্ছে। কিন্তু আমার কথা এখন থাক্, তোমার কথা শুনি। আছ কেমন?

ফণী একখানা বেঞ্চির উপর বিমলকে লইয়া বসিয়া বলিল—আরে ভাই, এ পৃথিবীটা এত বেশী নচ্ছার লোকে ভরা যে ভালো থাক্‌বার জো কি! তারা সব-কিছু পণ্ড কর্‌বার জন্যেই যেন ষড়যন্ত্র ক'রে বসে আছে, আমার বুদ্ধি-বিবেচনার জোরে কোন রকমে টিকে আছি! বুদ্ধির চাষ করো দাদা, বুদ্ধির চাষ করো,—নইলে তোমাদের ঐ গাঁজাখুরী কাব্যি কি দার্শনিকতা নিয়ে এই সংসারে একদিনও টিক্‌তে পারবে না।.........তুমি ত' জানো আমি কাজের লোক, বুদ্ধিটাকে কাজে খাটাতে চাই; কিন্তু যত-সব বোকার পাল্লায় পড়ে বুদ্ধি খোলবার কি জো আছে ছাই! একটা কাজে যেই হাত দেখো, অমনি

পাড়া-পড়শীরা এসে ঝাগ্‌ড়া দেবে ; কর্মচারীগুলো টিকটিক করবে ; এমন কি কুলিমজুরগুলো পর্যন্ত কথা শুন্‌বে না :—সকলের বিশ্বাস তারা আমার চেয়ে ভালো বোঝে, বেশী জানে ; আরে তাই যদি জান্‌বি তবে তোরা কেন চাকর-মজুর হলি, আর আমিই বা কেন জমিদারের ঘরে জন্মালাম—এই সোজা কথাটা ভেড়াগুলো বুঝবে না, আর আস্‌বে বক্‌বক্ করতে !

ফণী অনর্গল বকিয়া বিমলকে ইহাই বুঝাইতে চাহিল যে, তাহার জীবন শুধু বাধা-বিপত্তি, বিরোধ-অমিল, ঝগড়া-গণ্ডগোল ঠেলিয়া চলিতে চলিতে বড় বিস্বাদ বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। জমিদারীটা লইয়াও যে নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে তাহারও জো নাই ; শান্তনগরের ছঁদে প্রজারা ধর্মঘট করিয়া বসিয়াছে, টাকায় মাত্র চার আনা বৃদ্ধি তাহাও তাহারা দিবে না, এবং চীলহাটির মজুমদারেরা ফণীর লাঠিয়ালের কাছে হটিয়া গিয়া এখন সীমানা সাব্যস্তের জন্য মকদ্দমা করিয়া কাঁদিয়া জিতিতে চাহিতেছে ! অবশেষে ফণী জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এখন কি করছ হে—তোমাদের যা ধরা আছে—সেই বকেয়া ওকালতি ?

বিমল হাসিয়া বলিল—টো-টো কোম্পানির চাকরী নিয়েছি। দেশ-বিদেশে তীর্থপর্যটন ক'রে বেড়াচ্ছি।

ফণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বেশ আছ দাদা ! দিব্যি নানান্ দেশ দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছ ! সন্ন্যাসীঠাকুর, তোমার চেলা হতে পারলে বেশ হ'ত !

বিমল হাসিয়া উঠিয়া বলিল—আরে হয়ে পড় না, বাধা কি ? চল দিনকতক একসঙ্গে ঘুরে আসা যাক্, গাঁজার প্রসাদ দেবো !

ফণী হাসিতে চেষ্টা করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল—আমার কি

কোথাও এক পা নড়বার জো আছে, যে দিক্‌টিতে নজর না দেবো সব বেটা সেটা অমনি পণ্ড ক'রে বসে থাক্‌বে! আরো, জীবনে একটা বোকামি ক'রে ফেলেছি—আর নড়বার জো রাখিনি।

এমন সময় একজন খানসামা সেখানে আসিয়া বলিল—রাণীমা জিজ্ঞাসা করলেন চা কি এইখানে খাবেন?

ফণী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—নাঃ, নাঃ, ওপরের বৈঠকখানা ঘরে দিতে বল্‌গে যা।

বিমল হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—কি হে, এই বোকামির কথা বল্‌ছিলে বুঝি? বিয়ে করেছ? তাইতে অন্দরে পরপুরুষকে ঢুকতে দেখে তখন অমন ক'রে আঁৎকে উঠেছিলে,—ও! তুমি ভাই আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছ! আকাশ ভেঙে মাথায় পড়লেও এমন আশ্চর্য হতাম না! শেষকালে কিনা তুমি কাজের লোক এমন গাঁজাখুরি কাব্যি ক'রে ফেল্‌লে···প্রণয় এবং পরিণয়।

ফণী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—প্রণয়-ট্রনয় কিছু নয়, সংসারে একটা লোক নেই, ঘরকন্না কে দেখেশোনে তাই একটা—

বিমল ফণীর বর্বরতায় বিষণ্ণ হইল—যাহাকে বিবাহ করিয়াছে তাহাকে ভালোবাসে বলিতে তাহার কুণ্ঠা; ঘরকন্না চালাইবার দাসী বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই! বিমল জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—বেশ করেছ ভাই, বেশ করেছ! তোমার বাড়ীতে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছে, তখন লক্ষ্মীর সাম্‌নে লক্ষ্মীছাড়া বেশে যাব না, আমি চটপট হাতমুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে নি, তুমি একটু ব্যবস্থা করিয়ে দাও।

ফণী চাপরাসীকে হুকুম করিল—এই বাবুকে সঙ্গে নিয়ে যা। খানসামাকে বল্‌গে বাবুর হেফাজত করে।

বিমল উঠিয়া চলিয়া গেল। ফণীও যাইবে বলিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় একটি তন্বী-তরুণী অঙ্গের হিল্লোলে সমস্ত বাগানে সৌন্দর্য ছড়াইয়া ফণীর পিছনে আসিয়া উৎসুক ব্যগ্রতায় জিজ্ঞাসা করিল—ও কে? ও কে তোমার কাছে থেকে "লক্ষ্মীর সাম্‌নে লক্ষ্মীছাড়া বেশে যাব না" বলে উঠে গেল?

ফণী চট্ ফিরিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিয়া উঠিল—যূথি, আবার তুমি সন্ধ্যাবেলা বাগানে এসেছ? এ রকম একগুঁয়েমি আমার কাছে চলবে না···চেলীর কাপড় পরনি যে বড়? এখানে তোমার ঐ টোঙর-পনা চল্‌বে না, সোনাতলার রাণী হয়েছ, রাণীর সাজেই তোমাকে থাক্‌তে হবে? তুমি কি কচি খুকি যে, এক কথা তোমায় বিশ বার বল্‌তে হবে।

যূথিকা ভয় পাইয়া মিনতি করিয়া বলিল—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, তাই আমি তোমায় ডাকতে এসেছিলাম, আমি জানতাম না এখানে অপর কেউ আছে।

ফণী একটু উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—কেউ থাক আর না থাক, তুমি রাণী, সর্বদা রাণীর মতন সেজে থাক্‌তে হবে তোমাকে। অত সব কাপড়-চোপড় গহনা-পত্তর সব কি বাক্‌স-বন্দি ক'রে রাখবার জন্যে তোমায় দিয়েছি। ছোটলোক কিনা, ও সব বাপের জন্মে ত' অভ্যেস নেই—অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে!

চোখের জল হুকুমে ফিরাইয়া বড়, বড় চোখ দুটিতে কাতর মিনতি ভরিয়া যূথিকা ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। আমি সমস্ত দিন তোমায় দেখ্‌তে পাইনি, তুমি মহাল থেকে বরাবর বাগানে চলে এলে, তাই এখানে এসে তোমায় দেখ্‌ব বলে বাড়ীতে যেমন ছিলাম তেমনি চলে এসেছি। আর কখনো সাজ না ক'রে

ঘর থেকে বেরুব না। আজ আমাকে ক্ষমা করো—আর আমাকে বোকো না। যূথিকার অশ্রু আর বারণ মানিল না, বড় বড় ফোঁটায় তাহার বেদনারক্ত গালের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ফণী কড়া স্বরে বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, আচ্ছা, এখন বাড়ীতে যাও দেখি। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যানপ্যান কোরো না। আচ্ছা ছিচ্‌কাঁদুনে! পান্‌সে চোখে জল ঝরতেই আছে! শুনছ? যূথি, শুন্‌ছ! সেই আমার সহপাঠী বিমল—যার কথা তোমার কাছে গল্প করেছি—সে এসেছে! এখনি এসে পড়বে, তোমার কান্না থামাও বলছি! যাও, চা ঠিক করগে; সব যেন ঠিক থাকে—এই সব হাজারো ঝঞ্ঝাটের ওপর ঘরকন্নার ভারটাও আর আমাকে যেন নিজের হাতে নিতে না হয়। বুঝলে—একটু কিছুর ত্রুটি হলে মজা টের পাইয়ে দেবো। বিমল যেন নিন্দের কিছু না পায়!

ফণী হনহন করিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। যূথিকা ধীর মন্থর ক্লান্ত গতিতে বেদনার ভারে শিথিল হইয়া পড়িয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিল; তাহার ওষ্ঠপুটে একটি কি প্রশ্ন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বলিবার বড় আগ্রহেই সে প্রশ্ন তাহার অন্তরতম প্রদেশে রুদ্ধ হইয়াই রহিয়া গেল।

বিমল যখন কাপড় বদল করিয়া উপরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল তখন যূথিকা চা-দানি হইতে পেয়ালায় চা ঢালিতেছিল। মুখ তুলিয়া বিমলকে আসিতে দেখিয়াই তাহার হাত একবার এমন করিয়া কাঁপিয়া উঠিল যে, চা হাতের উপর চলকাইয়া টেবিলে পড়িয়া গেল। ফণী ধমক দিয়া উঠিল—যূথি !

যূথিকা ভয়চকিত দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া নতমুখে আবার চা ঢালিতে লাগিল। স্ত্রীর হাতে যে গরম চা পড়িয়া গেল, তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া ফণী গর্জন করিয়া তর্জন করিতে লাগিল—আঃ, অকর্মার ঢেঁকি ! তোমায় দিয়ে যদি একটা কিছু ভালো ক'রে হবার জো আছে। সাবধানে ঢাল্‌তে পার না! এলাহাবাদ থেকে আনা অমন টেবিল-ক্লথটা দাগী কর্‌লে !

বিমল ঘরে ঢুকিয়াই অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এ কি মানবী, না প্রতিমা ! এমন দীর্ঘ ঋজু সুশোভন শরীর, অমন উষার আভার মতো রং, অমন মিনতিভরা চকিত ম্লান দৃষ্টি, এমন হ্রীমণ্ডিত ধীতে উজ্জ্বল মুখশ্রী, সে ত' মানবীর দেখে নাই ! কিন্তু তাহার বিস্ময়-পুলকের স্বপ্নকুহক ভাঙিয়া গেল ফণীর ভর্ৎসনায়। আহা রে ! এমন দেবী প্রতিমাকেও ভর্ৎসনা করিতে পারে এমন নরাধমও আছে ! বিমল অগ্রসর হইয়া গিয়া নমস্কার করিয়া যূথিকাকে বলিল—আপনি রাখুন, গরম চা হাতে পড়ে আপনার হাত লাল হয়ে উঠেছে, আমি চা তৈরী ক'রে দিচ্ছি !

যূথিকা ভয়চকিত অপাঙ্গ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে বলিল শুধু—না।

ফণী হো হো করিয়া বলিল—না হে না, তুমি বোসো, ওই দিকে। তুমি সেই তেমনি gallant এখনো আছ!

যূথিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বিমল বিরক্ত হইল! ফণী হাহা করিয়া হসিয়া উঠিল। যূথিকা এইবার বিমলের দিকে এক পেয়ালা চা আগাইয়া দিয়া কণ্ঠস্বরে মিনতি ভরিয়া বলিল—আপনি বসুন।

সেই মৃদু অস্ফুট স্বর শুনিয়া বিমল একবার চমকিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যূথিকার মুখের দিকে চাহিল। তারপর যেন যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয় বলিয়া হতাশ হইয়া মাথা নাড়িয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ফণী যখন বিমলকে শোবার ঘরে পৌঁছিয়া দিতে গেল, তখন বিমল বন্ধুকে পত্নীভাগ্যের জন্য অন্তরিক সম্বর্ধনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সে ফণীর দুইহাত চাপিয়া ধরিয়া নাড়িয়া-নাড়িয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিল—বাস্তবিক ফণী, ভাগ্যদেবী চিরকাল তোমার ওপর সুপ্রসন্ন—তাঁর চরম প্রসাদ এই পরম লাভে!

ফণী শুষ্ক রকম অগ্রাহ্যের ভাবে বলিল—হাঁ, ও দেখ্‌তে শুন্‌তে নেহাত মন্দ নয়। এই হতভাগা পৃথিবীতে মনের মতন নিখুঁত জিনিস ত' পাবার জো নেই, মানুষকে ওরই মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ক'রে নিয়ে সয়ে থাকৃতে হয়।

—বল কি ফণী! সামঞ্জস্য ক'রে সয়ে থাকা এমন একটি অনুপমা মনোরমার বেলা বলা কি সাজে! এই বয়সে ঢের মেয়ে

দেখেছি—মেয়ের খোঁজেই জীবন সঁপেছি, তোমার গৃহলক্ষ্মীর মতন রূপেগুণে অপরূপ কোথাও দেখিনি। ঐ চোখ দুটিতে আহা কি করুণ ব্যথিত দৃষ্টি! শুভ্র কপালখানিতে যেন স্বর্গের আভাস! কার প্রশংসা বেশী করব্—শোভাসুন্দর দেহমন্দিরের, না মন্দিরবাসিনী মনোদেবতার!

ফণী রসিকতা করিল—হুঁ হুঁ! তুমি যে একেবারে মজে গেছ হে! আগে দেখ্‌তাম তুমি পড় বেশী, বলো কম; আজ যে উল্টো ব্যাপার! কিন্তু ভায়া, প্রণয়িনী নিয়ে কবিত্ব করা চলে, গৃহিণী হওয়া চাই কাজের লোক! ওটা দেখ্‌তে মাকাল ফল—কাজে-কর্মে কিছু না! তার পরিচয় চা ঢালাতেই পেয়ে এসেছ। আচ্ছা, এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও, দিল্লীর লাড্ডু খেয়ে তুমি যে এখনো পস্তাওনি তার জন্যে তোমায় আমি সম্বর্ধনা করছি। প্রণয় করতে হয় কোরো, পরিণয়টা যতদিন পার মুলতুবি রেখো। বড় ল্যাঠা হে, বড় ঝকমারি!

বিমল বিরক্ত হইয়া ফণীর চলিয়া-যাওয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—বর্বরটা এখনো তেমনি আছে! এমন দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠা ক'রেও সে চটা মেজাজে নরকের সৃষ্টি করছে। আহা বেচারি যূথিকা! এমন স্বামীর হাতে পড়ে সোনার প্রতিমার খোয়ার হচ্ছে!

বিমলের দৃষ্টি ত' এড়ায় নাই! যূথিকা যাহা বলিতেছিল বা করিতেছিল তাহা কত ভয়ে ভয়ে! স্বামীর চোখের ইসারায় যেন তাহার মরণ-বাঁচন। যদি কিছু ফণীর মনের মতন না হইতেছিল, অমনি ফণীর দৃষ্টি কি কঠোর কটমট হইয়া উঠিতেছিল। বিমল দেখিতেছে না মনে করিয়া ফণী কতবার তাহাকে চোখ রাঙাইয়াছে, দাঁতে দাঁত

দিয়া নীরব ভর্ৎসনা করিয়াছে, মুখ খিঁচাইয়া বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছে। আর সেই অপ্সরী কি মধুর ধৈর্যে এই সমস্ত সহ্য করিয়া থাকিয়াছে। তাহার দীর্ঘ বক্র পক্ষ্মরাজির নিবিড়তার পশ্চাতে চকিত তারকার কি এক বেদনায় ম্লান করুণ ভাতি মেঘের আড়ালে চন্দ্রের মতো বড় সুন্দর! তাহার প্রচুর কালো চুল যেন বেদনার ছটার ন্যায় তাহার মলিন পাণ্ডু মুখখানিকে ঘিরিয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে। তুলিকার বহু সাধনার ধন তাহার নাকটি টিকল, গাল দুটি নিটোল, অধর-ওষ্ঠ রক্ত-পদ্মের দুখানি পাপড়ি। সেই ঠোঁট দুখানি অকথিত বেদনায় স্ফুরিত হইতেছিল, চোখ-দুটি অগলিত অশ্রুতে ভরিয়া আসিতেছিল, শ্রীর মন্দির বুক-খানি নিরুদ্ধ আবেগে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। তাহার অপ্সরার ন্যায় সুন্দর, রাণীর ন্যায় মহিমময়, স্বপ্নের ন্যায় অপরূপ, ফুলের ন্যায় পেলব তনুখানি ঘরের মধ্যে যেন মমতার মতন হাওয়ায় ভাসিয়া ফিরিতেছিল, তাহা যেন মাটি স্পর্শ করিতেছিল না। এ কি সম্ভব যে এ মহীয়সী রমণী ফণীর মতন বর্বরকে ভালবাসে! না এই সম্ভব যে,—এই অপ্সরার চোখের পাতার সান্দ্র ছায়ায় যে সুবিস্তৃত স্বপ্নলোক পলে পলে রচিত হয় তাহার সন্ধান ফণীর মতন লোকে পায়! এই জুলুমবাজ ক্ষুদ্র নবাবটির পীড়নে কি অমূল্য একটি প্রাণ নষ্ট হইতে বসিয়াছে! আহা বেচারী!

যূথিকার সৌন্দর্য ও নম্র কোমল ব্যবহারের মোহ বিমলের মন ক্রমশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। সে হঠাৎ সচেতন হইয়া তাড়াতাড়ি আপনার বুক-পকেট হইতে বৃদ্ধ অমৃতবাবুর দেওয়া ছবির মখমল-খাপটি টানিয়া বাহির করিল এবং ছবিখানি বাহির করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল—এ আমি করিতেছি কি! যে অদেখা-

অচেনা মুখখানিকে আজ তিন বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত খুঁজিয়া ফিরিতেছি, তাহার কাছে অপরাধী হইতেছি, বন্ধুর স্ত্রীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বন্ধুর কাছে অবিশ্বাসী হইতেছি। এ আমার কি অধঃপতন!

বিমল ছবি বাহির করিয়া বাতির আলোর সাম্নে ধরিয়া চমকিয়া উঠিল—এ যে যূথিকার ছবি! এ ছবি অমৃতবাবু বলিয়াছেন লীলার, আমার মন বলিয়াছে আমার অচেনা হারানো প্রিয়তমার; কিন্তু আমি যে দেখিতেছি ইহা কাহারো নয়, ইহা যূথিকার! এ কি সমস্যা! এই ত' সেই নাক, সেই মুখ, সেই চিবুক; গ্রীবাভঙ্গিটি পর্যন্ত ত' অবিকল! এ ছবি কার? যূথিকার? যূথিকা তবে কে? যূথিকার কণ্ঠস্বরও যেন ক্ষণে ক্ষণে আমাকে আমার সেই অল্প-দেখা হারানো তরুণীর কথাই মনে করাইয়া দিতেছিল। ক্ষণিকের মিলনে সে যখন আমার বুকের মধ্যে বাসা করিত, আমি আমার শাল দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতাম, তখন ত' অনুভব করিতাম তাহার দেহখানি যূথিকার মতনই তনু ও কোমল, ঋজু ও দীর্ঘ। যূথিকাও ত' আজ কতবার ঘন-ঘন চুরি করিয়া আমার দিকে চকিত করুণ দৃষ্টিপাত করিয়াছে! তবে সে কি আমাকে চিনিয়াছে? তবে কি যূথিকাই সেই আমার সকল-জীবন -ব্যর্থ-করা সকল-প্রাণ-ধন্য-করা হারানো রত্ন! অসম্ভব—আমি মূঢ়, শুক্তিতে হয়ত রজত ভ্রম করিতেছি। ফণীর মতন আভিজাত্য-গর্বিত স্ত্রী-চরিত্রে সন্দিহান খুঁৎখুঁতে লোক একটা অজানা অচেনা ভিখারিণী মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে, এও কি কখনো সম্ভব!

বিমল জীবন-মরণের আগ্রহ দিয়া ছবিখানি দেখিতে লাগিল —একবার মনে হয় সেই এই, আবার দ্বিধা জন্মে! তাহার নিজের উপর রাগ হইতে লাগিল, নিজের নিস্তেজ স্মৃতির উপর সে ধিক্কার

দিল ; মনে করিল, হয়ত এই ছবির সামান্য আদল হইতে কল্পনায় সে নিজের মনে যে ছবি গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা ক্রমশ এই ছবির সঙ্গে একাকার হইয়া উঠিয়াছে, এবং এখন আবার যূথিকার মধ্যে সেই আদল দেখিয়া তিনকে এক করিয়া গণ্ডগোল করিতেছে। ছবি খাপে ভরিয়া সে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল—ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন তাহার মনের ছবি ফুটাইয়া তুলিবে এই দুরাশায়।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া বিমল যখন কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া ফণীকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিবে স্থির করিয়া বাহিরে আসিল, তখন খানসামার কাছে শুনিল যে, রাজাবাবু ভোরে উঠিয়া মহাল তদারকে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বিমল জিজ্ঞাস করিল—আর তোমাদের রাণীমা? তিনি উঠেছেন?

তিনি ঘণ্টাখানেক আগে বাগানে তরকারী-তোলা তদারক করিতে গিয়াছেন।

বৈঠকখানায় অল্পক্ষণ পায়চারি করিতে-করিতে কাল রাতের ভাবনার কথা মনে করিয়া বিমলের হাসি পাইল। রাতের অন্ধকারে যে কল্পকুহক রচিত হয়, তাহা দিনের আলো লাগিলেই মিলাইয়া যায় ; তখন মরীচিকার ভ্রমে দিক্‌ভুল করিয়া পরে লজ্জিত হইতে হয়। মানুষ দূর হইতে প্রথম দৃষ্টিতে কত রকম ভুল করিয়া বসে।—আপাত-দৃষ্টিতে ফণীকে মনে হইতে পারে নিষ্ঠুর, কিন্তু তাহার সঙ্গে ঘর করিলেই বুঝা যায়, তাহার রকমটা একটু খাপছাড়া ও কর্কশ হইলেও বাস্তবিক সে লোক খারাপ নহে—একটু খেয়ালি একটু গোঁ ধরিয়া চলে ; কিন্তু অসহ্য বলা চলে না। সুতরাং যূথিকার দৃষ্টিতে বা মুখের ভাবে যে দুঃখ-ছায়ার আভাস সে দেখিয়াছে মনে

করিতেছিল তাহা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়; তাহার নম্রতাকে ব্যথিতের অবসাদ বলিয়া ভুল হইয়া থাকিবে। সর্দি হইয়া নাক-চোখ মুছিতে দেখিয়া এ যেন কান্না বলিয়া মনে করা! বিমল এমনি করিয়া আপনার মনের সন্দেহটাকে বিদ্রূপের ফুঁয়ে ফুঁকিয়া দিবার জন্য নানাবিধ উদ্ভট উপমায় আপনার মনের ভাবটাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে একটি টেবিল-আয়নার উপর একখানা বই-এর দিকে নজর পড়িল; অন্যমনস্কভাবে বইখানি তুলিয়া মলাট উল্টাইতেই চোখে পড়িল তাহার উপর মেয়েলি হাতে লেখা আছে—"যূথিকা বক্সীকে সাদর উপহার।"

বক্সী! বিমলের মনে চমক লাগিল—অমৃতবাবু বলিয়াছিলেন তাঁহার ভালবাসার লীলাকে হরণ করিয়াছিল—ললিত বক্সী! যদি যূথিকা সেই লীলার কন্যা হয়! তাই কি মায়ের ছবির সঙ্গে মেয়ের আদলের অমন মিল! যদি তাই হয়. তবে অমৃতবাবু কত খুশী হইবেন! বিমল এত সহজে তাঁহার হারানো নিধির সন্ধান পাইল কি? বিমল তাড়াতাড়ি বইখানি রাখিয়া দিল, কাহার পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। যূথিকা একটি অপরূপ মাধুর্যের হিল্লোলের মতো আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যার বাতির আলোতে দেখার চেয়ে প্রভাতের আলোতে তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাতঃস্নানে সিক্ত কেশরাশি আপনার প্রাচুর্যে কোমলতায় যূথিকার কমনীয় দেহলতার উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে; খোলা হাওয়ায় বেড়াইয়া আসাতে সদ্যস্নাতার মুখখানি উজ্জ্বল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে; অতিথিকে সেই মুখের হাসি দিয়া সম্ভাষণ করিয়া অকুণ্ঠিতা তরুণী যখন বিমলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বিমলের কেন কেবলি মনে হইতে লাগিল সে হাসি বড় বিষণ্ণ, অক্ষিপল্লব তাহার অশ্রুতে যেন

তখনো ভিক্ষা ! বিমল আপনার কল্পনা-প্রবণ মনকে শত ধিক্কার দিল, তবু তাহার ধারণার বদল হইতে চাহিল না।

ঘুমের ঘোরে ভোরের বেলা দূরের বাঁশীতে ভৈরবী আলাপ যেমন লাগে, তেমনি মিঠা মিহি সুরে যূথিকা অতিথিকে আহ্বান করিল—আপনি জল খাবেন আসুন। উনি ভোরে মহাল তদারকে বেরিয়ে গেছেন, ফিরতে বেলা হবে ; আমাকে ব'লে গেছেন অতিথির সেবা করতে !

বিমল এই অপরিচিতা সুন্দরীর কাছে একাকী থাকিতে কুণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ফণীর আজ না গেলে কি চল্‌তো না ?

—না। উনি কাজের লোক, সব কাজ নিজের চোখে দেখে না করালে মনঃপূত হয় না, রোজই তাঁকে কোথাও না কোথাও যেতে হয়। দিনের বেলা মহালেই খাওয়া-দাওয়া করেন, কোনো দিন বা সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফেরেন, কোনো দিন বা তাও ফেরেন না।

বিমল ব্যথিত হইয়া বলিয়া ফেলিল—আহা ! একলাটি তবে ত' আপনার বড় কষ্ট হয় !

যূথিকা আয়নার টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া এটা-ওটা গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে কম্পিত মৃদুস্বরে বলিল—একলা ? না একলার সাথী হাজার দিনের অতীত স্মৃতি ! আর এত বড় জমিদারের ঘরণীর কাজেরই কি কমি আছে ? একলা হবার জো নেই,—রাণীর কখনও মুখ ভার করতে নেই !

বিমল দেখিল আয়নার ছায়াতে যূথিকার অধর স্ফুরিত হইতেছে। "একলা হবার জো নেই—রাণীর কখনো মুখ ভার করতে নেই !"—আহা ! একি দারুণ বিলাপ-বাণী তোমার মুখে, হে সুন্দরী ! যে অতীত হাজার দিনের মোহন স্মৃতি তোমার ভিড়

করিয়া জমে, তাহাদিগকে তোমার হৃদয়ই দূরে রাখিতে চায়, না তোমার নির্দয় স্বামী তাহাদের কাছে তোমার হৃদয়কেই ভিড়িবার অবসর দেয় না ?—কিসে তোমার এমন ছুঃখ ? তোমার কণ্ঠের স্বর যে তোমার মুখের হাসিকে মিথ্যাবাদী করিতেছে !

বিমল নিজের মনের ভাবনা ও যূথিকার কথা অন্যদিকে ফিরাইয়া দিবার জন্য বলিল—গৃহই ত' গৃহলক্ষ্মীর ক্ষেত্র—আবহমান কাল তাঁরা অন্তঃপুরে একলা থেকেই এসেছেন।

যূথিকা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিমলের মুখের উপর অকুণ্ঠিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—এমন কথা আপনার মতন শিক্ষিত লোকের কাছে শুনব আশা করিনি। মেয়েরা যে অবরোধে রুদ্ধ থাকে সেটা কি স্বেচ্ছাসুখে ? কে তাদের বন্ধ রাখে ?

বিমল লজ্জিত হাস্যে বলিল—পুরুষেরা নিজেদের লজ্জা বাঁচাবার জন্যে অশিক্ষিত, অজ্ঞান, কথা-বল্‌তে-অক্ষম গৃহিণীদের গৃহে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়, নইলে তারা খেলো হয়ে যায় যে !

যূথিকা তাচ্ছিল্যের হাসিতে ধারালো কথায় শান দিয়া বলিল—পুরুষেরা নিজের অপরাধের জন্যে অপরকে এমনি করেও দোষী করতে পারে !

তাহার এই তাচ্ছিল্যের ও বিদ্রূপের ভাবে তাহাকে এমন সুন্দর দেখাইল ! আবেগে তাহার গালে গোলাপ ফুটিল, চোখে বিছ্যুৎ ঝলিল, হাসিতে জ্যোৎস্না ঝরিল ! তাহার মুখে এমন একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে বিমুগ্ধ বিমল ভাবিতে লাগিল—যূথিকার দেহ, না মন,—কোন্‌টা বেশী সুন্দর !

হঠাৎ জ্যোৎস্না-রাতে মেঘ হওয়ার মতন একটি মলিন বিষণ্ণতা যূথিকার প্রফুল্লতার উপর ছড়াইয়া পড়িল। বিমল অপ্রস্তুত হইয়া

গেল। যূথিকা অপ্রিয় প্রসঙ্গ অন্যদিকে ফিরাইয়া দিবার জন্য বলিল—ওঁর কাছে আপনার কথা আমি অনেকবার শুনেছি। আপনাকে ভারি দেখ্‌তে ইচ্ছা হ'ত। আপনি ত' আমাদের দেখতে আসেন নি।

বিমল বলিল—আমি জান্‌তাম না ফণী বিয়ে করেছে। মাত্র কাল সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে টের পেলাম। আপনার পিতৃপদবী ছিল বক্সী ?

যূথিকা হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, সেই অখ্যাত পদবী ত্যাগ ক'রে এখন নাগিনী হয়েছি !

—হ্যাঁ, সোনাতলার নাগ-বংশ প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু শ্রীপুরের বক্সী-বংশও অখ্যাত নয়।

যূথিকার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল—হাঁ, মায়ের কাছে শুনেছি বটে, শ্রীপুরের বক্সী-বংশ বনেদি জমিদার।

—আপনার বাবার নাম ত' ললিত বক্সী ? তিনি ত' শ্রীপুরের বড় শরিক।

যূথিকা আশ্চর্য হইয়া বিমলের দিকে চাহিল, তারপর কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে বলিল—আমি কখনো বাবাকে দেখিনি, মায়ের মুখে শুনেছিলাম।

আপনার মায়ের নাম ছিল লীলা, তাঁর বাপের বাড়ী ছিল পশ্চিমে ?

যূথিকার মুখ একেবারে পাঙাশ হইয়া গেল, সে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বলিয়া উঠিল—আপনি যে আমাদের সব পরিচয় জানেন দেখ্‌ছি ! মা বল্‌তেন বটে, তাঁরা পশ্চিমের বাসিন্দা ছিলেন।

—মা বল্‌তেন ? তিনি কি তবে মারা গেছেন ?

—হাঁ, আজ তিন বৎসর।

বিমল মিনতি করিয়া বলিল—মাপ করবেন, আমি আর একটা প্রশ্ন করব।...বিমল কেমন করিয়া প্রশ্নটা করিবে এই ভাবিয়া ইতস্তত করিতে করিতে বলিয়া ফেলিল—আপনার বাবা আপনার মায়ের সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করেন নি?

যূথিকা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিল—আপনি কি আমার বাবাকে কি মাকে চিনতেন নাকি?

বিমল বুকের ভিতর হইতে লীলার ছবিখানি বাহির করিয়া যূথিকার সাম্‌নে পাতিয়া ধরিয়া বলিল—এই ইনি আপনার মা?

যূথিকা মোহগ্রস্তের মতন অবাক হইয়া বিমলের দিকে চাহিয়া থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

বিমল তখন বলিতে লাগিল—আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন, আশ্চর্য হবারই কথা। ঘটনাটা আগাগোড়াই আশ্চর্য! আমি আপনার বাবা বা মায়ের সঙ্গে বা তাঁদের বংশের সঙ্গেও পরিচিত নই। আমি আমার একটি নিরুদ্দেশ বন্ধুকে দেশে দেশে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম; পথে ট্রেনে এক বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় হয়ে গেল। তিনি আপনার মায়ের আত্মীয়। তিনিও আপনার মায়েরই খোঁজে বেরিয়েছিলেন।

বিমল অতি সন্তর্পণে যূথিকার মনে একটুও আঘাত না লাগে এমন সাবধানে বাঁচাইয়া ভাষা যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন ও কোমল করিয়া অমৃতবাবুর সহিত লীলার প্রণয় হইতে ললিতের সঙ্গে লীলার পলায়ন এবং অবশেষে ললিতের লীলাকে পরিত্যাগ করা পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী ধীরে ধীরে যূথিকাকে শুনাইল। তারপর বলিল—আহা, অমৃতবাবু আপনার খবর পেলে কত খুশীই হবেন!

যূথিকার চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

বিমল বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল—ওকি! আপনাকে শেষে আমি কাঁদালাম? আমাকে মাপ করবেন, আমি মন্দ ভেবে কিছু বলিনি।

যূথিকা অশ্রু মুছিবার চেষ্টা করিতে করিতে ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে বলিল—না, না, আপনি কোনো অন্যায় করেন নি।

বিমল ক্ষুব্ধচিত্তে ঘরের এদিক-ওদিক পায়চারি করিতে লাগিল। যূথিকা চোখ মুছিয়া বলিতে লাগিল—এ জগতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই মনে করতাম।

যূথিকা কেউ কথাটির উপর জোর দিয়া বলিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল। তখনি আবার আপনাকে সম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিল—আমি পিতার পরিত্যক্ত মায়ের একমাত্র সন্তান; মা স্বামীর অবহেলার অপমানে মর্মাহত হয়ে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন—কখনো কোনো আত্মীয়ের মুখ আমি জন্মে দেখিনি। তিনিই আমার পিতা মাতা বন্ধু শিক্ষক সবই ছিলেন; আমি লেখাপড়া কাজকর্ম শিল্পকলা যা একটু শিখতে পেরেছি, কেবল তাঁরই একার যত্নে—মা আমার এমনি গুণবতী ছিলেন। আমি বড় হয়ে উঠ্‌লে যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলাম যে মা আমার কী সয়েছেন—তাঁর শরীর মন একেবারে ভেঙে গেছে। তাঁর ইতিহাস তিনি ইচ্ছে ক'রে যতটুকু আমায় বলেছিলেন, তার বেশী আমি জিজ্ঞাসাও করিনি, জানিও নি। তাই তিনি যখন স্বর্গে গেলেন আমি সংসারে একেবারে তখন একলা, কাউকে চিনতাম না যে তার কাছে গিয়ে বল্‌ব—ওগো আমার মা নেই, তুমিই আমার মা বাবা ভাই বোন!

যূথিকা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিমল বলিল—আর আপনি নির্বান্ধব নন। স্নেহপ্রাণ অমৃতবাবু আপনাকে পিতার অধিক যত্ন কর্‌বেন। তাঁর মতন আত্মীয় পেয়ে ফণীও খুব খুশী হবে।

যূথিকা অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া বুক-ভাঙা নিরাশার স্বরে বলিয়া উঠিল—উনি? উনি খুশী হবেন?—যূথিকা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিমল অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, অমৃতবাবুর ন্যায় অমায়িক ও ধনী আত্মীয় লাভ করিয়া ফণী খুশী না হইবে কেন? অমৃতবাবু বিবাহ করেন নাই; তাঁহার অতুল সম্পত্তি ত' যূথিকাই পাইবে।

যূথিকা ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল—আপনি আপনার বন্ধুকে কিচ্ছু চেনেন না। অসাধারণ কিছু ঘটা, বা তিনি নিজের মনে যা এঁচে বসে আছেন তার উল্টো কিছু ঘটা উনি মোটেই বরদাস্ত কর্‌তে পারেন না। যূথিকা স্বামীর প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ প্রকাশ না করিয়া কোমল স্বরে সহজভাবেই বলিতে লাগিল—আমি নির্বান্ধব গরিবের মেয়ে বলেই উনি আমায় বিয়ে করেছিলেন; একজন অজ্ঞাতকুলশীল অনাথ মেয়েকে তিনি যে গ্রহণ করেছেন এ তাঁর বিশেষ উদারতা আর দয়া বলেই আমি চিরকাল মান্‌ব। উনি ত' আমাকে প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দ্যান—আমি ছোটলোকের মেয়ে, তাঁর হাতে পড়ে রাণী হয়েছি। তিনি অমুক রাজার মেয়ে কি অমুক রাজার বোন্‌কে ত' বিয়ে কর্‌তে পার্‌তেন! করেননি, সে ত' আমারই সৌভাগ্য!

যূথিকার অশ্রুধারা খরস্রোতে বহিতে লাগিল।

বিমলের মন সেই করুণ বর্ষার বিষণ্ণতায় ছাইয়া গেল। বিমল ভাবিতে লাগিল—হায় হায়! আমি সান্ত্বনা খুঁজিতে এ কোন্

বিষাদ-পুরীতে আসিয়া পড়িলাম। এ বিবাহ ত' সুখের নয়, দম্পতির মধ্যে ত' প্রণয়ের লেশমাত্র নাই। যূথিকা অনাথ নিরাশ্রয় হইয়া আশ্রয় পাইবে বলিয়া ফণীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, আর ফণী যূথিকাকে বিবাহ করিয়াছে।—যূথিকা সুন্দরী, শিক্ষিতা, বয়সে ডাগর আর গৃহস্থালী তদারকে যোগ্য বলিয়া! কি দুর্ভাগ্য যূথিকার! বর্বরটা স্ত্রীর বংশমর্যাদার অভাব তুলিয়া খোঁটা ছায়, আর সে যে বিবাহ করিয়া তাহাকে কতখানি অনুগ্রহ করিয়াছে তাহাও জানাইতে লজ্জা বোধ করে না! বিমলের মন বন্ধুর প্রতি বিরক্তিতে ও তাহার সুন্দরী দুঃখিনী স্ত্রীর প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। বিমল খুব ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়া যূথিকাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—এসব কথা তবে আপনার আর আমার মনের মধ্যেই গোপন থাক; ফণী এর এক বর্ণও শুনতে পাবে না।

যূথিকা মুখ তুলিয়া বিমলের মুখের দিকে সোজা তাকাইল। বিস্ফারিত উজ্জ্বল চক্ষু হইতে অশ্রুধারা শুষ্ক হইয়া গেল, তাহার সুন্দর মুখে একটা আত্মদমনের কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল। যূথিকা হঠাৎ চেয়ার ঠেলিয়া টেবিলের সাম্‌নে উঠিয়া দাঁড়াইল—সে কী দৃপ্ত ভঙ্গি, যেন তাহার দীর্ঘ ঋজু দেহখানি আরো ঋজু, আরো দীর্ঘ হইয়া উঠিল! যূথিকা বিস্মিত বিমলকে বলিল—দেখুন বিমলবাবু, আপনি যা বল্লেন তাই আপনার মনের ইচ্ছে,—এ বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না! আপনি কি ভেবেছেন যে সোনাতলার রাজার রাণী আপনার কাছে কোন কথা শুনে, তা স্বামীর কাছে থেকে গোপন ক'রে রাখ্‌বে?

যূথিকা গর্বভরে আপনার চারিদিকে তাচ্ছিল্য ছড়াইয়া আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া

গেল। বিমল বুঝিতে পারিতেছিল না যে সে এমন কি বলিয়াছে যাহার জন্য যূথিকার এত রাগ হইতে পারে! তথাপি সে ক্ষমা চাহিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু বিস্মিত ও অপ্রস্তুত বিমল ভর্ৎসনার প্রথম ধাক্কা সাম্‌লাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার আগেই যূথিকা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

বিমল বিরক্ত হইয়া জলখাবারের কথা ভুলিয়া বাগানে বাহির হইয়া পড়িল! সে নিজের অসাবধানতা, না যূথিকার ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার উপর বেশী রাগ করিবে, ঠিক করিতে পারিতেছিল না। খানিকক্ষণ বেড়াইতে বেড়াইতে রক্ত একটু ঠাণ্ডা হইলে বিমল দেখিল যূথিকার একটুও দোষ নাই। বিমল তাহাকে তাহার জন্ম-কাহিনী শুনাইয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ফলে সে নিজের মন যতটুকু বিমলের কাছে খুলিয়া ফেলিয়াছিল তাহার জন্যই সে লজ্জিত ও প্রভুধর্মী স্বামীর ভয়ে ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার উপর বিমলের কথা গোপন রাখার প্রস্তাবে সম্মত হইলে যূথিকাকে একবারে বিমলের মুঠির মধ্যে গিয়া পড়িতে হইত। এই প্রস্তাবে অমন দৃপ্তভাবে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাওয়াতে বিমলের মন যূথিকার প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল—এই উনিশ বৎসরের তরুণীর মনের এতখানি শক্তি, এমন বিবেচনা, এমন উচিত-অনুচিতের সূক্ষ্ম অনুভূতি, এমন বিশুদ্ধ শুচিতা বিমলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সে জীবনে এই প্রথম অনুভব করিল শিক্ষিত ভব্য মহিলার মনে এমন একটি প্রকৃতিগত সূক্ষ্ম শুচিতা ও আত্মজয়ের শক্তি জন্মে যে, তাহা আশ্চর্য রকমের অবোধ্য, তাহা অতিবড় আত্মম্ভরী পুরুষেরও অসাধ্য ও অনায়ত্ত।

সমস্ত দিন বিমল যূথিকার দেখা পাইল না; খানসামাদের হামেহাল যত্নে তাহার আতিথ্যেরও কোনো ত্রুটি হইল না।

সন্ধ্যার সময় ফণী বাড়ীতে ফিরিল। যূথিকা স্বামীর সাড়া পাইয়া তাহার স্বাভাবিক মাধুর্যে আজ অধিক আগ্রহ ও মমতা মিশাইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে গেল।

ফণী স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া বিরক্তি-কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিল—আঃ সরো। সমস্ত দিন হট্‌রানি আর হয়রানির পর ন্যাকামি ভালো লাগে না······জ্বালাতন! খাবার হয়েছে? খাবার দাওগে যাও···

ফণী মুখ ভার করিয়া খাইতে বসিল। বিমলের কোন কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না। যূথিকা ম্লান বিবর্ণ মুখে কলের পুতুলের মতন তাহাদিগকে নীরবে পরিবেশন করিতেছিল। হঠাৎ ফণী স্ত্রীর সাম্‌নেই অশ্লীল গালাগালি দিয়া বলিয়া উঠিল—বুঝেছ বিমল, পাগলাচরের সমস্ত প্রজা একজোট হয়ে চীলহাটির মজুমদারদের খাজনা দিতে শুরু করেছে—মজুমদারেরা বিনা খাজনায় ওদের দাখিলা কেটে দিচ্ছে, ইচ্ছেটা যে শেষে প্রমাণ করবে পাগলাচর মৌজাটা ওদেরই জমিদারীর সামানাভুক্ত! দেখেছ শালাদের কি রকম পেজোমি!

তাহার পর ফণী তাহার প্রজা ও প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারদের যে সব বাক্যে অভিহিত করিতে লাগিল তাহা ভদ্রসমাজে বলিবার নয়। যূথিকার যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল; বিমলের গলা

দিয়া খাবার নামিতে চাহিতেছিল না, সে কাহারও দিকে চাহিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ যূথিকা আপনাকে সোজা করিয়া তুলিয়া খানসামাদের সেখান হইতে চলিয়া যাইতে ইসারা করিল এবং আপনাকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়া বলিয়া উঠিল—দেখ, আজ সকাল বেলা বিমলবাবু একটা মজার খবর শুনিয়েছেন। আমার মামার বাড়ীর কি বাপের বাড়ীর সম্পর্কে কেউ কোথাও নেই বলে আমরা প্রায়ই দুঃখ করতাম। বিমলবাবু আমার মামার বাড়ীর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন!

ফণী বন্ধুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। বিমল থতমত খাইয়া গেল। কারণ এই বিষয়টি খুব ঘুরাইয়া যূথিকার মান ও মন বাঁচাইয়া ফণীর কাছে বলিতে হইবে। বিমল অমৃতবাবুর সঙ্গে তাহার পরিচয়ের গল্প ও তাঁহার সহিত যূথিকার মায়ের সম্পর্ক এবং তাহার পতিকুলের পরিচয় মাত্র ফণীকে শুনাইল—অমৃতবাবুর সহিত লীলার প্রণয় বা ললিতের সহিত লীলার পলায়ন-ব্যাপারের উল্লেখ করিল না।

যূথিকা ও বিমলের আন্দাজ ও আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করিয়া দিয়া ফণী খুব খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল—বা রে মজা! মাইরি যূথি, তুমি বুড়ো অমৃতবাবুর অনেক টাকা মার্‌বে দেখ্‌ছি!

যূথিকা স্বামীর এই চাষাড়ে মোটা রসিকতায় অতিথির সাম্‌নে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; তথাপি তাহার বুক হইতে একটা ভারী বোঝা নামিয়া গেল। ফণী উৎসাহিত হইয়া যূথিকার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিতে লাগিল—দেখ বিমল, তুমি আজই সেই বুড়োটাকে একটা টেলিগ্রাম ক'রে দাও যে তার হারানিধি পাওয়া গেছে—তার

টাকাগুলো চট্‌পট্ দেবার ব্যবস্থা করুক।...আচ্ছা বিমল, বুড়োটার কত টাকা আছে কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিলে? লিখে দিয়ো, বুড়োটা যেন কোম্পানির কাগজ ক'রে টাকাগুলো শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে যেন জ্বালাতে না আসে। আচ্ছা, খুড়ীর ভাইঝির ওপর তার এত দরদ কেন, বল দেখি? ভেতরে কিছু ছিল-টিল না কি?

যূথিকা পরিবেশনের থালা মাটিতে ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। বিমলও অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল; সে বুঝিতে পারিতেছিল না যে ফণী কেমন করিয়া তাহার ঐ নম্র ভব্য সুশিক্ষিতা স্ত্রীর কাছে এমন অভব্য বর্বরতা প্রকাশ করিতে পারে! একজন অল্পপরিচিত অতিথির সাম্‌নে তাহার মাকে লক্ষ্য করিয়া বর্বর রকমের ভোঁতা রসিকতাটা যে যূথিকার প্রাণে কতখানি রূঢ়ভাবে গিয়া বাজিয়াছে তাহা অনুভব করিয়া ব্যথিত বিরক্ত হইয়া বিমল বলিল—দেখ ফণী, তুমি এই পাড়াগাঁয়ে থেকে থেকে একবারে চাষাড়ে অসভ্য হয়ে গেছ? তুমি কি মনে কর যে আমি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হতেই তোমাদের পাড়াগেঁয়েদের মতন অভদ্র প্রশ্ন ক'রে জিজ্ঞাসা করেছি—মশায়ের ব্যাতন?

ফণী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি এতদিনেও একটুও বদলাওনি! আরে কার কত টাকা আছে না জানলে তার কদর কতখানি জানব কি করে? তোমাদের মত হচ্ছে লোকটা যদি কথাবার্তায় সাম্‌লে-সুমলে চলে ত' সে গরীব হলেও ভদ্রলোক। আরে! টাকা নেই বলেই ত' সে অমন মিন্‌মিন্ করছে; আসুক তার হাতে টাকা, তখন দেখবে তার বুকে হুব হয়েছে, মুখে কথাও

ফুটেছে, মন যা চায় তাই করবার সাহসও হয়েছে। টাকাই সব হে! আমার পিসতুত ভাই যে অমর, তাদের বাড়ীতে যখন প্রথম আমি যূথিকাকে দেখি, তখনই ঐ কুড়ুনি ছুঁড়ির তেজ দেখে আমি ঠাউরেছিলাম ও লক্ষ্মীর বরপাত্র না হয়ে যায় না; যার অত তেজ তার কেউ না কেউ টাকাওয়ালা আপনার লোক আছে, একদিন না একদিন ও টাকার মুখ দেখেছে, আবার দেখবে! তবে না আমি ওকে বিয়ে করেছিলুম, নইলে পথের একটা কুড়ুনি ছুঁড়িকে কি আমি বিয়ে করি হে! দেখেছ হে, শর্মা কি রকম লোক চেনে!

রাঁধুনি আসিয়া পরিবেশন করিতে লাগিল। ফণী চোখ পাকাইয়া ধমকাইয়া উঠিল—তুমি কি করতে এলে? তোমাদের রাণী কোথায় গেলেন?

রাঁধুনি থতমত খাইয়া গেল—আজ্ঞে···তিনি···ঐ···

বিমল তাড়াতাড়ি বলিল—তিনি এখন ওদিকেই থাকুন; তোমার কাছ থেকে তোমাদের বিয়ের গল্পটা শুনে নিই।

ফণী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—সে ভারী মজা হে! ঐ চীলহাটির মজুমদারেরা এইজন্যেই ত' আমার ওপর এত খাপ্পা! তাদের একটা মেয়ে আমায় গছাবে বলে ঝুলোঝুলি, আমি মতও দিয়েছিলাম। কারণ মজুমদারের এক ছেলে আর এক মেয়ে; ছেলেটা যদি চট্‌পট্‌ টেঁসে যায় তা হ'লে সমস্ত জমিদারীটা মেয়েরই হবে, সেই এঁচেই আমি মত দিয়েছিলাম। এমন সময় গেলাম পিসিমাদের নেমন্তন্ন করতে যে চীলহাটির মজুমদারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে। আর প্রজাপতির এমনি মারপ্যাঁচ, পড়বি ত' পড় যূথিকার সাম্‌নে! রূপ-টুপের তোয়াক্কা রাখিনে যদিচ, তবু আচমকা

থমকে গেলাম। অমরকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, পিসিমা তিথি করতে গিয়ে ওকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছেন। ভদ্রলোকের মেয়ে, ওর মা মরবার সময় ওকে পিসিমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে, না অমনি একটা কিছু। পিসিমাও বললেন যে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছেন ওরা ভদ্র কায়স্থ, এককালে মেয়ের একজন বাপও ছিল। জান ত' আমাকে, আমি চিরকাল কাজের লোক—চারিদিক হিসেব ক'রে চলি, তোমাদের প্রেম-প্রণয় sentiment emotion কবিত্ব কোন বালাই-এর ধার ধারিনে। আমি দেখলাম আমার বাড়ীতে লোকজন গিন্নি-বান্নি কেউ নেই! মজুমদারদের প্যানপেনে খুকিটা এসে আমায় জ্বালিয়েই মারবে! তার চেয়ে এই চটপটে সকল কর্মে পটু, সুস্থ, সবল, পরিশ্রমী, লেখাপড়া-জানা, ডাগর মেয়েটাকে যদি আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি তা হলে ওকে দিয়ে ঘুঁটে কুড়োনো থেকে কেরাণীগিরি পর্যন্ত ঘরকন্নার সব কাজই চলবে—আর কোন কাজ করতে ওর অপমানও বোধ হবে না। অধিকন্তু আমি ওকে পথের ধুলো থেকে তুলে রাণীর সিংহাসনে বসিয়ে দিলে ও চির জীবন আমার কেনা দাসী হয়েই থাকবে, আর ভয়ে ভয়েও থাকবে পাছে একটু ত্রুটি হ'লে আমি আবার ওকে রাণীর আসন থেকে নামিয়ে পথে দাঁড় করিয়ে দি! শাসনে সাম্‌লে না রাখলে মেয়ে মানুষ জাতটাকে ত' এক কড়ার বিশ্বাস নেই—কিন্তু তোমরা ভাবুক মানুষ, বলবে নারী হলেন দেবী পরী অপ্সরী আরো কত কি! যাক্ সে কথা। তারপর বলি শোন। আমি ওর সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা কর্‌লাম, ও অমনি একটুতেই ফোঁস ক'রে উঠ্‌তে লাগল। ওকে আমার দেশে নিয়ে এসে রাখতে চাইলাম, ও ফর্‌কে রাগ ক'রে চলে গেল। তখন অগত্যা কি করি, বিয়েই করব ঠিক কর্‌লাম।

আমি পিসিমাকে বল্লাম ওকেই আমি বিয়ে করব। পিসিমা কপালে চোখ তুললেন, অম্‌রা পিঠে চাপড় মারলে, আর যূথিকা কেঁদে ফেললে। পিসিমা বল্‌লেন—পাগল ছেলে, এও কি একটা কথা! যূথির বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে—আমাদের গোমস্তা গুরু-দয়ালের বৌ মারা গেছে, তাকে থিতু করাও হবে, যূথিরও একটা হিল্লে লাগবে। গুরুদয়াল লোকটা, জানো বিমল, বাহাত্তর বছরের বুড়ো! তার সঙ্গে যূথির বিয়ে দেওয়াটা অম্‌রার চাল, বুঝলে কিনা! গুরুদয়ালকে সাম্‌নে শিখণ্ডী খাড়া ক'রে আড়াল থেকে উনিই বাণ মারবেন ঠাউরেছিলেন। অম্‌রার সব মতলব ফাঁসিয়ে দিয়ে আমি বল্‌লাম—তা বেশ হয়েছে, গুরুদয়াল তবে আমার কনে মজুমদারের মেয়েকে বিয়ে করুক, আমি তার কনে যূথিকাকে বিয়ে করি। পিসিমা ভয় দেখালেন, মজুমদারেরা চটে অনিষ্ট করবে ; অম্‌রা ভয় দেখালে, অচেনা-অজানা মেয়েকে বিয়ে কর্‌লে, জ্ঞাত-কুটুম্ব কেউ আমার বাড়ী পাত পাড়বে না। আমার রোখ চেপে উঠল ; যূথিকার মৌন সম্মতির লক্ষণ জেনে, আমি তাকে নিয়ে একেবারে জেলায় চলে গেলাম আর জ্ঞাত-কুটুম্ব গুরু-পুরোহিতকে কলা দেখিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে civil marriage আইন অনুসারে রেজেস্টারী ক'রে বিয়ে হয়ে গেল। আমার এই চালের মধ্যে গূঢ় আর একটু যে জমিদারী বুদ্ধি খেলিয়েছি, তা তোমরা সাধারণ লোকে চট্‌ ক'রে বুঝতে পার্‌বে না—রেজেস্টারী ক'রে চুক্তির বিয়ের সুবিধাটা এই যে, যখন খুশী ওকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব। হিন্দু বিয়েতেও সে সুবিধা ছিল, কিন্তু তাতে সেই ত্যাগটা একতরফা বলে মনের মধ্যে moral binding-এর একটা খোঁচ চিরজীবন খচ্‌ খচ্‌ কর্‌তে থাকে। এ চুক্তির বিয়ে, ফারখত হয়ে গেলে তুমিও খালাস, আমিও খালাস—ব্যস! কেমন,

ভালো বুদ্ধি খেলিয়েছি কি না!—বলিয়া ফণী গর্বভরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিমল ফণীর হৃদয়হীন বর্বরতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন তোমার স্ত্রীর হৃদয়-মনের পরিচয় পেয়ে নিশ্চয় তুমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছ?

ফণী বলিল—তা এক রকম। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর লেখা-পড়ার ঝোঁকটা বড় জ্বালায়—ঘরকন্নার কাজে গাফিলতি আমি বরদাস্ত করতে পারিনে।

—তা দু-চারটে ঝি-চাকর-রাঁধুনি রাখলেই ত' পার; সব কাজ ঐ একটা মানুষকে দিয়ে করানো কি ঠিক!

—ঝি-চাকর! রামঃ! তোমার কবে সাংসারিক জ্ঞান হবে হে? ভাড়া করা লোক দিয়ে কখনো কাজ হয়? তারা চুরি করেই দুদিনে ফতুর ক'রে ছেড়ে দেবে। কিন্তু যূথিকাকে নিয়ে পারবার জো নেই, একটা রাঁধুনি রেখেছে—বাইরের লোকজন এলে তাকে খেতে দেবার একজন লোক চাই ব'লে আমিও বেশী আপত্তি করিনি। রাঁধুনীর মাইনে আর চুরির ক্ষতিটা তোমার অমৃতবাবুর কোম্পানির কাগজ-গুলো সুদসুদ্ধ পুষিয়ে দিতে পারবে বোধ হয়, কি বল হে?

বিমলের অন্তর ও ভব্যতা এমন আহত হইয়া উঠিয়াছিল যে সে আর কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি নিজের নির্দিষ্ট শুইবার ঘরে লুকাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

প্রত্যূষে উঠিয়া ফণী মহাল তদারকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, বিমল আসিয়া তাহার সঙ্গী হইতে চাহিল। সে আজ যূথিকার কাছ হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে চায়।

উভয়ে ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল। বিমল একবার পিছন ফিরিয়া বাড়ীর দিকে তাকাইতেই দেখিল, যূথিকা উপরের একটা জান্‌লায় দাঁড়াইয়া আছে। বিমলের বোধ হইল যেন যূথিকা একবার চোখ মুছিল। বিমল ফণীকে বলিল—ওহে, তোমার বৌ তোমার বিরহে কাঁদচে—ঐ দেখ। আজ আর না হয় নাই গেলে?

বিমল তাহাকে দেখিতেছে বুঝিয়া যূথিকা জান্‌লা হইতে সরিয়া চলিয়া গেল।

ফণী জান্‌লার দিকে একবার ফিরিয়া না তাকাইয়া মুখে একটা চুরুট চাপিয়া দেশলাই বাহির করিতে করিতে চাপা ঠোঁটে বলিল—ফোঃ! তুমি কি মনে কর ভাবুকতা কর্‌বার আমার সময় বা শখ আছে! আমরা কাজের লোক, কারুর সঙ্গে যদি কিছু সম্পর্ক থাকে ত' সে কাজের সম্পর্ক! চোখের জল, নাকের জল, দীর্ঘশ্বাস, হা-হুতাশ আমার স্ত্রীরও আমি বরদাস্ত করব তুমি মনে কর? পুরুষেরা আস্কারা দিয়েই ত' মেয়েদের মাথা খায়; আমি সর্বদা স্ত্রীকে কড়া শাসনে রাখি। যদি কখনো বিয়ে কর, আমার মতন রাশ ভারি রেখো, সুখে থাক্‌বে। কোথাও যেতে হবে, ঠিক যাবার সময়টিতে গাড়ীর মাথায় মোটমাটরি সমস্ত চাপিয়ে তারপর স্ত্রীকে

বলবে—চল্লাম। প্রথম প্রথম সে কপালে চোখ তুলবে, কিন্তু শিগ্‌গির ঢিট হয়ে যাবে। ফোঁস-ফোঁসানি ভ্রূক্ষেপ কোরো না, দেখবে স্ত্রী কি রকম খাতির ক'রে চলবে—জানো ত' স্ত্রীলোক নুন ঝাল টক্ খুব খর হওয়া ভালোবাসে; স্বামীটি একেবারে পান্তা হলে ওরা পেয়ে বসে, তাই স্বামীরও খুব গরম হওয়া চাই!

ফণী এই সদুপদেশ দিয়া চুরুট ধরাইয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষাইল। বিমল অবাক হইয়া ঘোড়ার পিঠে বসিয়াই রহিল। সে যে গেল না ফণী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। ফণী অদৃশ্য হইয়া গেলে বিমল ঘোড়া হইতে নামিয়া বাড়ীতে ফিরিল। বিমল ভাবিতে লাগিল—আহা যূথিকা! সে স্বামীর সকল অসভ্যতা অত্যাচার অবহেলা কি সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে—মুখে একটি রা নেই। এ কি স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে? অমন অপ্সরার মতন মেয়ে এমন দৈত্যের মতন স্বামীকে কি ভালোবাসতে পারে ঠিক? আহা এই দুর্লভ রত্ন যদি কোন জহুরীর হাতে পড়্‌ত!

বিমল উপরে উঠিয়া বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, যূথিকা কাব্য-গ্রন্থাবলী পড়িতেছে। নিজের প্রিয় কবি যে যূথিকারও প্রিয় ইহা দেখিয়া বিমলের মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল;—যূথিকা চিরটা কাল দুঃখের মধ্যে পালিত হইয়া আসিয়াছে, বিবাহের পর সে ফণীন্দ্রনাথ নাগের ন্যায় অসাহিত্যিক জমিদারের গৃহিণী হইয়াছে; তাহার মধ্যে সে কেমন করিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রসের আস্বাদ পাইয়া তাহার অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিমল বুঝিতে পারিল না। যূথিকার রসবোধ ও সৎসাহিত্যের প্রতি অনুরাগের মধ্যে বিমল যূথিকার উচ্চ মনের নূতন পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইল।

যূথিকা মনে করিয়াছিল বিমল ফণীর সঙ্গে মহালে চলিয়া

গিয়াছে। হঠাৎ বিমলের অপ্রত্যাশিত আগমনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যেন কোনো অপকর্মের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে এমনি কুণ্ঠার সহিত বইখানি লুকাইয়া লজ্জিত দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চাহিল। বিমল বুঝিল এ বাড়ীতে যূথিকাকে লুকাইয়া লুকাইয়া চুরি করিয়া লেখাপড়া করিতে হয়। বিমল হাসিয়া বলিল, আপনি যে কবিটির রচনা পড়ছিলেন, তাঁর রচনার অর্থ নেই ব'লে তাঁর অখ্যাতি আছে; আপনি সেই দুর্বোধ কবির সমাদর করেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

যূথিকা মৃদু কোমল স্বরে বলিল, এই কবির কাব্য যে ভাবের খনি! মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দ প্রণয়-পরিতাপ যত রকমের হতে পারে তা ইনি সব খোলসা ক'রে আমাদের সামনে বিশ্লেষণ ক'রে ধরেছেন! পাঠকের অন্তরে যখন যে ভাবটি প্রবল থাকে, ঠিক সেই ভাবটির মূর্তিমান প্রকাশ যে এই কাব্যগ্রন্থের পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে পেয়ে তার মন আপনাকেই প্রকাশ ক'রে বাঁচে। ইনি যেন অপটু বোবা পাঠকদের উকিল—তাদের জবানী তাদের মনের কথা টেনে বার ক'রে লিখে গেছেন! ফুলের সুগন্ধ আমরা উপভোগ করি, ইনি সেইসঙ্গে তার অন্তরের বাহিরের গোপন রূপও প্রকাশ ক'রে আমাদের সামনে ধরতে পারেন। এইখানেই এই মহাকবির কৃতিত্ব—ইনি শুধু ভাবের চিত্রকর নন, ইনি ভাবের বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত! ভাষার তীক্ষ্ণ ছুরিতে প্রত্যেক তন্তু চিরে চিরে উপমা-রূপকের অণুবীক্ষণে চোখের সাম্‌নে তাদের বড় ক'রে ধরে দিয়ে ইনি মানবের অন্তরের ব্যবচ্ছেদ করেন, তাতে মানবাত্মার যে-গোপনপুরে ভাবের পরে ভাবের ঢেউ দোল খায়, যেখানে শতেক ভাবের ফুল ফোটে, যেখানে হাজার ভাবের নক্ষত্র জ্বলে, সেই অপূর্ব কল্পলোকের স্বপ্ন-কুহরে পাঠকের

দৃষ্টি পৌঁছায় ; সে অবাক আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে, এই অনুপম সৃষ্টিবৈচিত্র্যে সে অস্পন্দ বিস্ময়ে দৃষ্টি হতে প্রশংসা বর্ষণ করে। এর মধ্যে শুধু রচনার কৌশল নয়, সৃষ্টির আনন্দও পুঞ্জিত হয়ে আছে—তাই এই কবির কাব্য কখনো পুরানো হয় না।

যূথিকার বোধশক্তি, বলিবার বচনবিন্যাস ও হৃদয়ের ভাবপ্রাচুর্য দেখিয়া বিমল আশ্চর্য ও আনন্দিত হইল। বিমল বলিল—ঠিক বলেছেন আপনি, আমাদের কবি যে গানের কবি! আমরা তাঁর সুরের মোহে এমন তন্ময় হয়ে যাই যে কথার দিকে আর খেয়াল থাকে না ; তিনি স্বপ্নের জাল বুনে তার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের চোখে আনন্দের স্বর্গপুরের আভাস দিয়ে যান ; তাই আমরা ঠিক ক'রে তাঁর সব কথার মানের খুঁটিনাটি ধরতে না পেরে তাঁর অতি-ঐশ্বর্যের জন্যে তাঁকে গালি দিই—তোমার কবিতা হেঁয়ালি, কিচ্ছু বোঝা যায় না! আমার বয়ে নিয়ে যাবার সাধ্যের অতিরিক্ত দান পেয়ে আমি যদি দাতাকে গালি দি, সে যেমন এও তেমনি! দোষ কি দাতার প্রচুর দানের, না আমার বহনের অক্ষমতার?

যূথিকা চক্ষে অশ্রু ভরিয়া বলিল, এঁর কাছে যে আমার হৃদয় কতখানি ঋণী তা বল্‌তে পারিনে। অমৃত-প্রলেপের মতন এঁর সান্ত্বনা আমার সকল দুঃখের জ্বালাকে স্নিগ্ধ শীতল আবরণে ঢেকে রেখেছে। এই কবির সাক্ষাৎ না পেলে আমি হয়ত এতদিন বাঁচতাম না।

বিমল বিস্মিত হইয়া বলিল—এত কি দুঃখ আপনার! আপনি রাজরাণী। বাপ-মা ত' লোকের চিরকাল থাকে না, তাঁদের জন্য শোক কি!

যূথিকা ব্যথিত হইয়া বলিল—আপনারা পুরুষমানুষ ; সাপের

খোলস ছাড়ার মত এক একটা দুঃখকে পিছে ফেলে আপনারা অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারেন। আমরা মেয়েমানুষ ; গুটিপোকার মতন আমরা দুঃখের জালেই নিজেদের জড়িয়ে অবরুদ্ধ ক'রে রাখি।

বিমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—উপমাটা আপনার ঠিক হ'ল না। গুটিপোকা গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে রঙিন পাখা মেলে উড়ে যায় ; আর সাপ খোলস ছেড়ে মুষড়ে পড়ে থাকে কুশ্রী দুর্বল হয়ে। অন্তত সাপের মতন খোলস ছাড়াও যদি সম্ভব হ'ত, আমাকে তা হলে এমন ক'রে ছুটে ছুটে পথে পথে বেড়াতে হ'ত না, কোন একটি অচেনা অজানা লোকের সন্ধানে! তাকে সে ক'দিন কতটুকু দেখেছিলাম, কিন্তু তার সন্ধানে ছুটে মরা ত' আমার এখনও শেষ হ'ল না!

যূথিকা পাংশুমুখে ভয়চকিত দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চাহিয়া কেমন এক ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি তাহলে কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ?

বিমল বিমর্ষ হইয়া বলিল—হ্যাঁ, সে আজ তিন বচ্ছর অবিশ্রাম!

যূথিকা হাসিতে চেষ্টা করিয়া লঘুভাবে বলিল, সেই ভাগ্যবতীটি কে বলুন না, আমরা ঘটকালি করি।

বিমলের মনে হইল যূথিকা কথাটা লঘুভাবে বলিতে চাহিলেও তাহার স্বর যেন কাঁপিয়া গেল।

বিমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি দুর্ভাগা, যাকে আমি খুঁজে মরছি তাকে আমি চিনি না, তবু তাকেই শুধু আমি চাই। দিন কয়েক শুধু তাকে ঘোমটায় ঢাকা দেখেছি, তার মুখ দেখিনি, পরিচয় পাইনি, কে সে—কোথায় থাকে জানি না, তবু তাকেই খুঁজে ছুটে বেড়াচ্ছি!

যূথিকা অবাক হইয়া বিমলের দিকে তাকাইয়া বলিল—আশ্চর্য! নতুন রকমের প্রণয়-ব্যাপার বটে! যার জন্যে আপনি শরীর মন সময় নষ্ট করছেন, জানেন কি সে আপনাকে ভালোবাসে কি না, সে আপনার প্রতি এখনও অনুরক্ত কি না?

বিমল গম্ভীর ধীর স্বরে উচ্ছ্বসিত বেদনাকে দমন করিয়া বলিল—আমি কিচ্ছু জানিনে। শুধু এই জানি যে যদি তাকে কোনদিন 'আমার' বলতে পারি, তবে আমার সুখের অন্ত থাক্‌বে না! কিন্তু এও যেন বুঝতে পারছি আমার ভাগ্যে তাকে পাওয়া নেই, তার আশা আমায় ত্যাগ করতে হবে।

বিমলের অশ্রু রোধ করা কঠিন হইয়া উঠিল। বুকের পকেটে ছবিখানিকে চাপিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সে চলিয়া গেল।

যূথিকার কোমল মন এই নবাগত স্বল্পপরিচিত অতিথির ব্যথায় মথিত হইয়া উঠিল—সমবেদনার অশ্রু তাহার দীর্ঘ বক্র পক্ষ্মরাজি বহিয়া বড় বড় ফোঁটায় ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ এক ফোঁটা জল টপ করিয়া হাতের উপর পড়িতেই যূথিকার চমক ভাঙিল; যেন গোপন অপকর্মে ধরা পড়িয়া সে লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া আপনার দুর্বলতা গোপন করিয়া গৃহকর্ম দেখিতে চলিয়া গেল।

যতদিন না অমৃতবাবুর কোনো সংবাদ আসে ততদিন বিমলকে থাকিয়া যাইবার জন্য ফণী পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়াছে। যূথিকার দৃষ্টিতেও উৎসুক অনুরোধের আভাস পাইয়া বিমল সম্মত হইয়াছে।

ফণী বন্ধুর খাতিরে যূথিকার সহিত একটু সদয় ব্যবহার করিতেছে। যূথিকার খাটুনিও এখন একটু কম হইয়াছে—একজন দাসী রাখা হইয়াছে। যূথিকা এখন দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যায় পড়িবার অবসর পায়; স্বামী মহাল তদারকে গেলে স্বামীর বন্ধুর সহিত সে গল্প করে, দুজনে মিলিয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে দুদিনেই যূথিকার মধ্যে যেন নব-জীবনের সঞ্চার হইল। তাহার সেই ভয়ে ভয়ে থাকার ভাব কাটিয়া গেল; তাহার মুখের হাসি এখন আর ধার করিয়া জোর করিয়া আনিতে হয় না, বসন্তের পুষ্পমঞ্জরীর মতো এখন তাহা আপনার আনন্দেই ফুটিয়া উঠে; তাহার কুণ্ঠিত পদক্ষেপ দৃঢ় হইয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গে যৌবনের চঞ্চলতা স্ফূর্তি পাইয়াছে।

কিন্তু বিমল দিন দিন বড় ম্লান ও বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিল। যূথিকার মনের উপরকার বাধা-বন্ধ মোচনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতির স্ফুরণ বিমলকে বড় ঘন ঘন আর একজনের কথা মনে করাইয়া দিতেছিল। যূথিকার অকারণ আনন্দে উদ্বেল চঞ্চলতা দেখিয়া বিমলের মনে হইত এমনি ভাব সে আর-একজনের দেখিয়াছে! যূথিকার আনন্দমুখর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া বিমল ভাবিত, এই স্বরই

সে আগেও শুনিয়াছে ; যে আদল দেখিয়া বিমল যূথিকার মা লীলার ছবি আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই আদল সে যূথিকার অধরে ও চিবুকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে দেখিয়া ক্ষণে ক্ষণে চকিত চমকিত হইয়া উঠে। বিমল আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার না করিলেও যূথিকার আতিথ্যের যত্ন, বন্ধুত্বের আত্মীয়তা তাহাকে অল্পে অল্পে মুগ্ধ করিতেছিল। প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যা যেন উৎসবের নবীন বেশে তাহাদের দুজনের মধ্যে অবতীর্ণ হইত ; যূথিকা নিজের হাতে আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া পরিবেশন করিয়া বিমলকে খাওয়াইত—সেই আহার কোনো দিন বা নদীর উপরে বারান্দায় বসিয়া সম্মুখে সবুজ ধানের ক্ষেতের স্নিগ্ধতার অঞ্জনে চোখ জুড়াইয়া, কোনো দিন বা বাগানের দিকের ঘরে বসিয়া বাগানের মনোরম সৌন্দর্যে মন ভুলাইয়া। কোনো দিন প্রভাতে যূথিকা অতিথিকে লইয়া নদীর কোলে একটি পুষ্পিত লতার কুঞ্জের মধ্যে গিয়া বসিত—সেখানে প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ, গোলাপের কেয়ারির জমাট গন্ধ, নবারুণের গোলাপী আভা এবং পাখীর কলকাকলি ছাড়া আর কেহ তাহাদের বিশ্রম্ভ-আলাপে বিঘ্ন ঘটাইতে আসিত না। যূথিকা প্রতিদিন যেন নব নব বিস্ময়ের আনন্দে অতিথির অভ্যর্থনা করিতে চাহিতেছে! মুগ্ধ বিমল যখন অবাক্-দৃষ্টিতে তাহার আনন্দময়ী মূর্তির দিকে তাকাইয়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইত না, তখন কী সহজে যূথিকা কথা আরম্ভ করিত—এবং রঙ্গ-রসিকতায় উজ্জ্বল সরস বাক্যের ফোয়ারা খুলিয়া তাহার চারিদিক ঝলমল করিয়া তুলিত। যখন যূথিকা নিজের হাতে বিমলের উচ্ছিষ্ট খাদ্যের পাত্র সরাইয়া রাখিয়া আসিয়া বিমলের হাতে একখানি বই তুলিয়া দিয়া আপনি তাহার পাশে সেলাই লইয়া বসিত, তখন বিমলের নিকটে বিশ্ব-চরাচর লুপ্ত হইয়া

যাইত—মুহূর্তের জন্য তাহার ভ্রম হইত সে যেন উপন্যাসের সুখী স্বামী, তাহার প্রণয়িণী পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া আনন্দ-স্বপ্নের কুহকজাল বয়ন করিতেছে।

এই সময় অমৃতবাবুর টেলিগ্রাম আসিল। তিনি সমস্ত বিষয়ের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছেন ; শীঘ্রই বর্মা হইতে রওনা হইবেন। যূথিকা ও ফণী আনন্দিত হইল, অমৃতবাবু না আসা পর্যন্ত বিমলকেও থাকিতে হইবে।

কিন্তু যূথিকা ও বিমলের একান্ত বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটাইয়া ফণীর পিস্তুত ভাই অমর ও তাহার স্ত্রী এবং অমরের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি আসিয়া উপস্থিত হইল। ফণী বলিল—আজ অমৃতবাবুর খবরের সঙ্গে সঙ্গে কুটুম্বরা এসেছে, আজ উৎসব হোক্। আজ বন-ভোজন!

ফণী তাড়া দিয়া দিয়া যূথিকাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এক সঙ্গে হাজার ফরমাস করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ সে-সমস্ত সম্পন্ন হইতেছে না বলিয়া রুষ্ট হইতেছে এবং যাহাও সম্পন্ন হইতেছে তাহাও তাহার মনের মতন হইতেছে না বলিয়া যূথিকাকে তিরস্কার করিতেছে। বাগানের কোন্ জায়গাটায় বনভোজন হইবে, যূথিকা তাহা ঠিক করিতে পারিতেছে না কেন? যে জায়গাটায় উনন খোঁড়া হইল তাহাতে নূতন লিচু গাছটায় তাত লাগিবে যে, যূথিকা ইহাও একটু দেখাইয়া দিতে পারে নাই? এখনো ভাঁড়ার খুলিয়া সিধা বাহির করিয়া দেওয়া হইল না? আঃ! আজ বাড়ীতে কুটুম্ব আসিয়াছে, যূথিকা নূতন বেনারসী শাড়ীখানা এখনো পরে নাই কেন? রেশমী শাড়ী পরিয়াছে, তাহাতে কিসের দাগ লাগাইয়াছে? নূতন হীরার ব্রুচটা কি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া ধোঁয়া দিবার জন্য কেনা হইয়াছিল? কুটুম্বদের জলখাবার দিয়া কাছে বসিয়া যূথিকা

খাওয়াইল না কেন, রান্না ত' রাঁধুনিতে চড়াইয়াছে, সেখানে যূথিকার থাকার এমন কি প্রয়োজন? চাকর-দাসীর হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া পুরুষদের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া থাকিলে ত' চলিবে না, রান্নার তদারক কর গিয়া, নিজেরা না করিলে বনভোজনের মজা কি? যূথিকা বাগানে গিয়া থাকিলেই চলিবে না, তাহাকে নবাগত অতিথিদের পান-চুরুট দিয়া আদর-আপ্যায়ন করিতে হইবে না! এমনি বিরুদ্ধ রকমের শত ফরমাসের ধারা-বর্ষণ যূথিকা হাসিমুখে প্রশান্তভাবেই সহ্য করিতেছিল এবং একা একশ' হইয়া বাড়ী হইতে বাগান ও বাগান হইতে বাড়ীতে লঘু-ক্ষিপ্র পদে ছুটাছুটি করিতেছিল।

যূথিকার প্রতি এই অত্যাচার বিমলের দৃষ্টি এড়াইতে পারিতেছিল না। সে ইহাতে বিরক্ত ও বিষণ্ণ হইয়া চুপ করিয়া একপাশে বসিয়াছিল। ফণী ও অমর তাহাদের ভগ্নীপতির ভগ্নীর উদ্দেশ্যে এবং উহাদের ভগ্নীপতি ইহাদের ভগ্নী ও পত্নীদের লইয়া সকলের সমক্ষে নির্লজ্জ রসিকতা জুড়িয়া যে হট্টগোল করিতেছিল তাহা বিমলের ন্যায় ভব্য ও মার্জিত-রুচির লোকের কাছে অত্যন্ত অশুচি ও কর্ণপীড়াদায়ক বোধ হইতেছিল।

বিমল যে অস্বস্তি বোধ করিতেছে তাহা যূথিকা একবার ঘরে ঢুকিয়াই বুঝিতে পারিল। সে যেন বিমলকে ডাকিতেই ঘরে ঢুকিয়াছে এমনিভাবে বলিয়া উঠিল—বিমলবাবু, আপনি এখানে বসে বসে কি করছেন? আপনি আমার সঙ্গে বাগানে চলুন। আজকের দিনে কুটুম্বুর মত চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে না, কাজ করতে হবে।

অমর হাসিয়া বলিল—বলি বৌদি, এতটা পক্ষপাত কি ভালো! কুটুম্বুরা বসে আছে ব'লে খোঁটাও দিলে, আবার ডাক পড়ল শুধু

বিমলবাবুকে। কি কাজ কর্‌তে হবে হুকুম কর; আমরাও কাজ কর্‌তে পারি।

যূথিকা আয়নায়-পড়া রৌদ্রের মত আপনার চারিদিকে হাসি ঠিকরাইয়া বলিল—আপনারা আজকের নতুন প্রধান অতিথি! বিমলবাবু পুরানো হয়েছেন, আজকে তিনি বাড়ীর লোকের সামিল।

অমরের ভগ্নীপতি বলিল—বাড়ীর লোকটিকে খারিজ ক'রে একা বিমলবাবুকে নিয়ে বাগানে যাওয়াটা ফণী প্রাণে সইবে না বৌঠাক্‌রুণ। তাই বল্‌ছিলাম আমরাও না হয় সঙ্গে থাকি।

যূথিকার মুখ লজ্জায় ঘৃণায় বিরক্তিতে লাল হইয়া উঠিল! যূথিকা কাহারো দিকে না তাকাইয়া বিরক্তিভরা স্বরে বলিয়া গেল—বিমলবাবু, আপনি আসুন।

বিমলও বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল!

তাহাদের পশ্চাতে কুটুম্ব-কুটুম্বিনীদের হাসি-টিট্‌কারি অট্টরোল করিয়া উঠিল।

বাগানে গিয়া অসংখ্য ফরমাস করিয়া, নানা কাজে খাটাইয়া, কৃত-কর্মের ভুল ধরিয়া যূথিকা এক দণ্ডের মধ্যে বিমলকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিল। যূথিকা যে তাহাকে বন্ধু ভাবিয়া অতিথিদের চমৎকৃত করিবার বিবিধ আয়োজনের গোপনতার মধ্যে তাহাকেই কেবল ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহা ভাবিয়া বিমলের আনন্দের অবধি রহিল না। আহারের সমস্ত আয়োজন দুজনে সম্পূর্ণ করিয়া যূথিকা অভ্যাগতদের আহ্বান করিতে গেল।

অভ্যাগতদের বিস্মিত মুগ্ধ করিবার প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। ফুলের টব সিঁড়ির মত থাক্ থাক্ করিয়া সাজাইয়া একটি মন্দির করা হইয়াছিল; সেই বৃক্ষ-মন্দিরের ভিতর একটি জরির কাজ-করা

কার্পেটের তাঁবু খাটানো হইয়াছিল ; খাওয়ার ঠাঁই ঘিরিয়া পুষ্পিতা লতার কুঞ্জ ; তাহার মধ্যে-মধ্যে বুলবুল-মুনিয়া-ক্যানারী-দোয়েল পাখী পুষ্প-মণ্ডিত দণ্ডে বসিয়া কূজন করিতেছে, শিশ দিতেছে ; বসিবার আসনের পাশে পাশে ক্ষীণা স্রোতস্বিনী পাথরের নুড়ির গায়ে হোঁচট খাইতে খাইতে উছলিয়া কলনিঃস্বনে বহিয়া চলিয়াছে। অভ্যাগতরা খাইতে বসিবামাত্র কোন্ কুঞ্জান্তরাল হইতে বীণা ও সেতার সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। খাওয়া শেষ করিয়া স্রোতস্বিনীর জলে হাতমুখ ধুইয়া নিমন্ত্রিতরা উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র বীণা ও সেতার থামিয়া গেল ; কুঞ্জান্তরাল হইতে বাহির হইয়া যূথিকা ও বিমল হাসিমুখে তাঁবুর দুই ধারে সোনার বাটায় পান লইয়া দাঁড়াইল—পুরুষদিগের যূথিকা ও মেয়েদের বিমল পান দিল। তারপর পুষ্পাস্তীর্ণ কার্পেট-বিছানো পথ দিয়া তরুবীথির আঁকা-বাঁকা চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বিমল ও যূথিকা আগে আগে পথ দেখাইয়া তাহাদিগকে পাশের কামরায় লইয়া গেল। পাশের কামরায় নীল মখমলের উপর জরির-বুটি-দেওয়া চাঁদোয়া খাটানো ও সবুজ কিংখাবের ফরাস বিছানো আছে—যেন সবুজ ক্ষেত্রের উপর নীল আকাশ তারকাখচিত। অভ্যাগতরা ফরাসে বসিবামাত্র বিমল ও যূথিকা দুইদিক হইতে দুইটি রেশমী দড়ি ধরিয়া টানিল আর অম্নি মাথার উপরকার চন্দ্রাতপ মাঝখানে ফাঁক হইয়া অভ্যাগতদের মাথায় চন্দনলিপ্ত পুষ্পবৃষ্টি করিল, আর বাহিরে নহবত বাজিতে লাগিল।

ফণী স্ত্রীর কৃতিত্বে গর্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারও বিস্ময় আনন্দের অবধি ছিল না। যূথিকা যে কত গাছ কাটিয়াছে, পাতা ভাঙিয়াছে আজ সে তাহার জন্য তাহাকে দোষী করিল না,

ভৎর্সনা করিল না ; মুগ্ধ স্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অমর ফণীকে বলিল—দেখ দাদা, তোমার বৌটি একটি রত্ন !

ফণী হাসিয়া উঠিয়া গর্বিতভাবে বলিল—তোমার মনে হচ্ছে, —আহা, কি রত্নই আমার হাত ফস্কে গেল ! কিন্তু তা নয় হে, তা নয়। তোমরা যখন ওকে তীর্থের পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলে তখন কি ওর কিছু গুণপনা ছিল, না তোমাদের গোমস্তা গুরুদয়ালের হাতে পড়লে ও এই সব শিখতে পারত ? ও আমার হাতে পড়ে রাজরাণী হয়ে আমার কাছ থেকেই এ সব শিখেছে ! মেয়েলোককে আস্কারা না দিয়ে শাসনে রাখলে কি চমৎকার ফল হয় দেখছ ত' ! এসব আমারই শিক্ষায় ! এসব আমারই শিক্ষার গুণ হে, আমারই শিক্ষার ফল !

কথা তুলিতে যা দেরী ছিল। অমনি সকলে যূথিকার দরিদ্র ঘরে জন্ম ও পরে রাজরাণী হওয়া লইয়া নানারূপ শ্লেষ ইঙ্গিত আরম্ভ করিল। যূথিকা প্রাণপণে হাসিমুখ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতে লাগিল।

বিমল আর সহ্য করিতে না পারিয়া যূথিকাকে বাঁচাইবার জন্য বলিয়া উঠিল—আসুন অমরবাবু, খানিক তাস খেলা যাক্।

ফণীর আজ দিল্ দরিয়া খোস মেজাজ, সকল তাতেই তাহার উৎসাহ। সে খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল—বেশ ! বাজি রেখে খেলতে হবে—যে হারবে তাকে জীবনের একটা কাহিনী বলতে হবে।

সকলেই উৎসাহিত হইয়া সায় দিল। বিমল ভালো তাস খেলিতে না জানিলেও কেবল যূথিকাকে বর্বরদের নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার জন্য খেলিতে বসিল। ফণী ও অমর একদিকে এবং অমরের ভগ্নীপতি ও বিমল অপর দিকে হইল।

যাহা হইবার তাহাই হইল, আনাড়ি বিমলের পক্ষের হার হইল। ফণী উল্লাসে অধীর হইয়া অট্টহাস্য করিয়া বিমলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল—এইবার বিমল, তোমাকে তোমার নিজের জীবনের কাহিনীটি বলতে হবে—সেই তোমার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর গল্প।

বিমলের মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে ভ্রূকুটি করিয়া ফণীর দিকে তাকাইয়া তাহাকে ক্ষান্ত হইবার ইঙ্গিত করিল। বিমলের রকম দেখিয়া অপর সকলে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিল—না জানি এই গল্পটায় কত মজাই আছে মনে করিয়া সকলেই সমস্বরে অনুরোধ করিতে লাগিল—হাঁ, হাঁ, সেই যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর গল্প! সেইটেই—তা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বিমল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—যেন পবিত্র দেবমন্দির অশুচি হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, পরম সমাদরের গোপন বেদনা নির্মল নিষ্ঠুরতায় অপমানিত হইবে।

ফণী তাহার অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া অধিকতর কৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, কি হে, তুমি বলবে? না, আমি আরম্ভ ক'রে লজ্জাটা ভেঙে দেবো?

ফণী পাছে তাহার বেদনার কাহিনী বিকৃত করিয়া কলুষিত অপমানিত করে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ম্লানমুখে বিষণ্ণকাতর কণ্ঠে বিমল বলিল, আমিই বলছি······

ফণী সকলকে আশ্বাস দিল যে বিমল যদি কিছু লুকাইতে চায় তাহা হইলে সে তাহা ফাঁস করিয়া দিবে, সে বিষয়ে শ্রোতারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

বিমল জীবনের মর্মকথা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল—

সে আজ প্রায় আড়াই বৎসরের কথা। আমাদের এম. এ. এগ্‌জামিনের আগে ফণী আর আমি পরামর্শ কর্‌লাম যে কলকাতা থেকে বাইরে কোথাও গিয়ে থাকা যাক্, মনটা নতুন জায়গায় গিয়ে খুশী থাকবে, পড়াও ভাল হবে। আমরা তুজনে এলাহাবাদে শহরের বাইরে যমুনার ধারে একটা বাংলো ভাড়া ক'রে গিয়ে থাক্‌লাম। ত্রিবেণী ঘাটের যে রাস্তাটি কেল্লার কোল দিয়ে যমুনার পুলের দিকে এসেছে তাকে ওখানকার লোকেরা বলে 'ঠাণ্ডী সড়ক'। চওড়া নির্জন রাস্তা, তার তুধারে নিমের গাছের সারি ; দিনের বেলাতেও সেই পথটি ছায়াশীতল মনোরম। আমরা সকাল-বিকেল ঐ পথ ধরে চলতে চলতে যমুনার পুল পার হয়ে বরাবর ওপারে চলে যেতাম : জ্যোৎস্না রাত্রে আমরা গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই রকম পথে পথে হট্‌রে বেড়াতাম। একদিন আমরা বেড়াতে বেড়াতে একেবারে নইনী চলে গিয়েছিলাম ; ফির্‌তে অনেক রাত হয়েছে—প্রায় এগারটা। কন্‌কনে শীত পড়েছে, ডিসেম্বর মাস। আমরা তুজনে আলষ্টার কোটে নিজেদের মুড়ে হন্‌হন্ ক'রে হেঁটে আস্‌ছি—তবু রক্ত গরম হতে চায় না। যমুনার পুলের ওপর আস্‌তেই জোলো হাওয়া কন্‌কনে ঝাপটা মেরে আমাদের হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপুনি জাগিয়ে তুলতে লাগল। আমরা হি-হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে নীরবে পুল পার হয়ে ডানদিকে মোড় ফিরেছি, হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালাম।

অত রাত্রে সেই শীতে একটা নিমগাছের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী মেয়ে—তার দেহখানি ছিপছিপে, নতুন চারা গাছের মত পাত্‌লা দীর্ঘ বাহুল্যবর্জিত ; তার পরণে একখানি নীল রঙের চুমুরী শাড়ী, আর নিবিড় ঘোম্‌টায় মুখ ঢেকে সর্বাঙ্গ ঘিরে আছে একখানি সবুজ ওড়না। হাওয়ার ঝাপটায় তার কাপড়-ওড়না তার গায়ে লিপ্ত হয়ে যাওয়াতে তার শরীরের গড়নের ছন্দ আর রেখার সৌন্দর্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরিয়েছিল ; সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রেও সে লুকাতে পারেনি তার তনুর সৌকুমার্য ; তার যৌবনের তরুণতা। একখানি ছোট্ট শুভ্র হাত পেতে সে সেই নির্জন পথে অত রাত্রে কার কাছে কি চাইবার প্রতীক্ষায় নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ! তার সামনে একটা চৌকোণা লণ্ঠনের মধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবে তারই প্রাণের মতো নিরাশার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে হিমকাতর বাতাসের ঘায়ে ক্ষণে ক্ষণে তার শিখাটিকে কাঁপিয়ে তুলছে—শিখাটি লুটোপুটি খেয়ে থেকে থেকে নিবু-নিবু হয়ে পড়ছে ! শিখার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুখানি সুন্দর পায়ের ওপর চাঁদের আলো আর শিখার আলো লুটোপুটি খাচ্ছে।

আমার দেখেই মনে হ'ল লক্ষ্মী যেন ভিক্ষায় বেরিয়েছেন ! কোনো বড় ঘরের মেয়ে দৈন্যদশায় পড়ে লোকের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু লজ্জায় সে এমন পথে দাঁড়িয়ে হাত পেতেছে যেখানে একটি লোকেরও সমাগম নেই। তার প্রসারিত হাত-খানি লণ্ঠনের শিখার চেয়েও বেশী কাঁপছিল ; শীতল হিম হাওয়া আর কম্পিত হাতের ওপর নিজের দুঃখ জানাবার ভার দিয়ে নীরব নতনেত্রে সে দাঁড়িয়েই রইল ;—অনেক অপেক্ষার পর যে দুটি মাত্র পথিকের সে দেখা পেয়েছে, তাদের কাছেও মুখ ফুটে কিছু চাইতে

পারলে না। আমি তাড়াতাড়ি আমার এ-পকেট সে-পকেট হাতড়ে দেখলাম, কোন পকেটে একটা পয়সা, কি আনি, কি দুয়ানি নেই ; আছে মাত্র একখানা নোট। আমি ফণীর দিকে ফিরে তার কাছে কিছু পয়সা চাইলাম। ফণীকে এত রাত্রে ঠাণ্ডা হাওয়ার মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছি ব'লে সে আমার উপর চটে উঠেছিল ; ব'লে উঠল—তুমি চলে এস হে চলে এস, ও তোমার পয়সার ভিখারিণী নয় !···আমি ফণীকে······

ফণী বাধা দিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—ছেড়ে যাচ্ছ ! সবটুকু বল।

বিমল তাহার কথা না শুনিয়া আবার বলিতে গেল—আমি ফণীকে বললাম······

ফণী আবার বাধা দিয়া বলিল—রুচি বাগীশের মুখে বাধছে বুঝি ! আমিই তবে বাকি কথাটুকু ব'লে দিই। আমি বিমলকে বললাম—তুমি চলে এস হে, চলে এস, ও তোমার পয়সার ভিখারিণী নয়, ও রসের ভিখারিণী ! ও অভিসারিকা !—যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধাবিনোদিনী ! কাঁদে রাধা বিরহিণী, তব প্রেম-ভিখারিণী !

ফণী মোটা গলায় সুর করিয়া গাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল !

বিমল যেন ফণীর কথা শুনিতেই পায় নাই, এমনি ভাবে বলিতে লাগিল—তবুও আমি ফণীর কাছে মিনতি ক'রে পয়সা চাইলাম ; ফণী আমার জামা ধরে হিড়হিড় ক'রে আমায় টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

তখন সেই অবগুণ্ঠিতা তরুণী কম্পিত মধুর সঙ্গীতের ন্যায় পরিষ্কার বাংলায় বললে—'বাবু, আপনারা বাঙালী ; অনাথ বিপন্ন বাঙালীর মেয়েকে দয়া ক'রে কিছু দিয়ে যান।' সেই স্বর, সেই কথা;

আর বিদেশে ভিখারিণীর কণ্ঠে আমারই মাতৃভাষা বাংলা একত্র মিশে আমার মনকে এমন স্পর্শ করলে যে আমি ফণীর ব্যঙ্গ উপেক্ষা ক'রে আবার তার কাছে পয়সা চাইলাম। ফণী সেই নিস্তব্ধ পথবীথি কম্পিত ক'রে হেসে উঠে বল্লে—'মরেছ। এই নাও দুটো টাকা, তোমার পথ নিষ্কণ্টক হোক, আমি চল্‌লাম। ফণীর কাছ থেকে টাকা নিতে আমার আর হাত সরল না; ফণী আমার হাতে টাকা দুটো গুঁজে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে চলে গেল। আমি কি করব ঠিক করতে না পেরে অবাক নিস্পন্দ অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, মেয়েটি ফণীর কথা ত' শুন্‌তে পেয়েছে, সে আমাকে না-জানি কি বর্বর দুর্বৃত্ত ঠাওরেছে! তার দরিদ্রতার অভিমান আমার ব্যবহারে একটুতেই আঘাত পাবে, অল্পেই শঙ্কিত হয়ে উঠবে। অমি ইতস্ততঃ করতে করতে একটু অগ্রসর হয়ে দয়ার্দ্র মিষ্ট স্বরে বল্‌লাম—তুমি ভিক্ষার জায়গা ত ভাল ঠাওরাওনি। 'চকের' দিকে গেলে অনেক লোকের দেখা পেতে। এই পথে দিনেই লোক চলে না, ত' এত রাত্রে কার দেখা পাবে?

ভিখারিণী অল্পক্ষণ কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইল, তারপর স্পষ্ট মার্জিত ভাষায় অতি মৃদু মধুর স্বরে ভৎর্সনাভরে বল্‌লে— যাদের দেখা পেয়েছি তাঁদেরও যদি বিপন্ন দরিদ্রের ওপর একটু দয়া থাকৃত!

তার এই কুণ্ঠিত অথচ তীব্র তিরস্কার, আর তার দৃপ্ত অভিমানের ভঙ্গী দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম; স্পষ্ট পরিচয় পেলাম সে নিরক্ষর সাধারণ স্ত্রীলোক নয়। আমি বললাম, আমি তোমার স্বদেশী; একজন পথিকের কাছ থেকে যতটুকু সাহায্য পাওয়া যায় তার বেশী আরও কিছু আমি করতে পেলে সুখী হব।

সে বোধ হয় আমায় একটু বিশ্বাস ক'রে একটু স্পষ্ট ক'রে বল্‌লে—আমরা গরীব, আমার মা মরণাপন্ন পীড়িত, আমাদের ভিক্ষা ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই।

আমি এই অপরিচিতা তরুণীর বিপদে মমতা বোধ ক'রে তাকে বললাম—আমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে চল।

সে অবাক হয়ে ঘোমটা ঢাকা মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে রইল, আমার প্রস্তাবটা বোধ হয় তার কাছে কেমন ঠেকছিল।

আমি তার ভাব বুঝে বললাম—আমাকে বিশ্বাস কর, তোমাদের সাহায্য করার ইচ্ছা ছাড়া আমার আর কোনো কু-অভিপ্রায় নেই।

অবগুণ্ঠিতা ভিখারিণী বললে—তবে আস্থন। সে লণ্ঠনটি তুলে ঘোমটাটি আরো একটু টেনে দিয়ে ওড়নাখানিকে ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আগে আগে রওনা হ'ল!

সেই ভিখারিণী-লক্ষ্মীর চরণপদ্ম পড়বে ব'লে চাঁদ যেন আপনার জ্যোৎস্না দিয়ে নিম্ববীথির পল্লবপুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে পথের পরে আলপনা এঁকে দিয়েছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে নিঃশব্দে তার পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম।

বিমল একটু থামিল। অমনি অসহিষ্ণু ফণী বলিয়া উঠিল—কি হে! এবারও সেবারের মতন তার পরের ঘটনা গোপন রাখবে নাকি? এ পর্যন্ত সব কথা ও ঠিক ঠিক বলেছে—এর আমি সাক্ষী। বিমল মনে করেছিল আমি বুঝি ওকে টাকা দিয়ে সত্যি সত্যিই চলে গেছি; আমি তা মোটেই যাইনি। একটা নিমগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। ওরা যখন চলে গেল তখন কেবল শীতের ভয়ে বন্ধুর অভিসারে গোয়েন্দাগিরি করতে ইচ্ছে

হ'ল না। তবে এ আমি জোর ক'রে বাজি রেখে বলতে পারি বিমলচন্দ্র গিয়ে ভিখারিণীর পীড়িত মা-ফা কিছুই দেখতে পাননি— ওর যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী আদ্যিকালের পুরানো গান শুধু নতুন সুরে গেয়ে শুনিয়েছিল মাত্র।

ফণী আপনার অভদ্র রসিকতায় খুশী হইয়া হাসিয়া উঠিল এবং অপর পুরুষ দুজনও তাহার কর্কশ হাসির সঙ্গে সমান বর্বরতার তাল রাখিয়া যোগ দিল এবং মেয়েরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া গেলেও তাহাদের চাপা হাসিতে যে কৌতুকচ্ছটা চক্‌মক্ করিতেছিল তাহাতে বুঝা যাইতেছিল যে তাহারাও ফণীর রসিকতায় আনন্দই উপভোগ করিতেছে; কিন্তু যূথিকা যেন অত্যন্ত বিরক্ত ব্যথিত হইতেছে বোধ হইতে লাগিল; কারণ সে মৃত্যুর মতন শাদা হইয়া গিয়া দুই হাতে পানের বাটাটি চাপিয়া ধরিয়া বসিয়াছিল এবং তাহাতে বাটার উপরকার বাটিগুলি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে টুনটুন্ শব্দ করিতেছিল। যূথিকা ম্লান কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে একবার বিমলের মুখের দিকে চাহিল।

বিমল ফণীদের হাসিতে বাধা দিয়া অকুণ্ঠিত দৃপ্ত স্বরে বলিতে লাগিল—আমার হারের বাজির দেনা বোধ হয় শোধ করেছি। কিন্তু আমার আর সেই যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর চরিত্রের বিরুদ্ধে আমার বন্ধুর ইঙ্গিত আমাকে পরের ঘটনাও বলতে বাধ্য করছে। আমি শপথ ক'রে বলছি, যা বলব তার এক বর্ণও মিথ্যা, বানানো বা অসম্পূর্ণ গোপন রাখা নয়—আমি তার নাম জানিনে, পরেও জান্‌তে পারিনি, আমি তাকে ফণীর ঠাট্টা করা থেকেই যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী ব'লেই ডাক্‌তাম, এবং সংক্ষেপে বোঝাবার জন্যে তাকে পুলিনা বলব! সেই মেয়েটি আমাকে পথ দেখিয়ে আগে আগে

চলল। আমি তার গতির ভঙ্গী, হাঁটার লীলা আর অঙ্গের হিল্লোলের মধ্যে নবযৌবনের লাবণ্য মাধুর্য প্রাণময়তা অনুভব কর্‌ছিলাম—সে পদক্ষেপ কি লঘু, কি ক্ষিপ্র, কি আনন্দচপল। আমি তার ঘোমটার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তার মুখ দেখবার আশায় তাড়াতাড়ি তার পাশে পাশে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম 'তোমার মা কি অনেক দিন থেকে পীড়িত?' সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, 'হাঁ, ছু' বছর! কিন্তু আটদিন থেকে বড় বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে।' 'তুমি কি রোজই ওখানে দাঁড়াও?' 'না, আজ এই প্রথম বাড়ী থেকে বাইরে বেরিয়েছি।' 'তোমার ঐ নির্জন জায়গায় দাঁড়ানো ত ঠিক হয়নি, তার চেয়ে চকের দিকে গেলে—বলতে গিয়েই কথা বেধে গেল, বুঝতে পারলাম কথাটা বলা ভালো হ'ল না, ও হয়ত দূষ্য ভাবতে পারে। যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললে—'আমি যে এখানে নিতান্ত অজানা, শহরের কোন্‌দিকে কি কিছুই জানিনে, আর লোকের ভিড়ের সামনে বেরুতেও যে লজ্জা করে।' কী দারুণ ছুঃখ-দৈন্য এই সুন্দরী তরুণীকে ভিক্ষায় বার করেছে! ছু-একবার ফণীর ইঙ্গিতটা আমার মনেও যে উঁকি মারেনি তা নয়, কিন্তু পুলিনার সরল ভদ্র কথাবার্তায় সে ভাব শীঘ্রই কেটে গেল। যদি সে ভ্রষ্ট-চরিত্রের হ'ত, তবে সে এমন সংযত সম্ভ্রান্ত আচরণ বরাবর বজায় রাখতে পারত না। না,—নির্দোষ দরিদ্রতার যে লজ্জিত দৃপ্ত কুণ্ঠিত অভিমান তার চলায় বলায় প্রকাশ পেয়ে অধিকতর মর্মস্পর্শী হচ্ছিল, তা কখনো ছলনা হতে পারে না।

আমি অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—তোমার মাকে কোন ডাক্তার দেখছেন?

—একজন দেখছিলেন। কিন্তু আমরা তার ফি জোগাতে না

পারাতে তিনি মাকে হাসপাতালে পাঠাতে পরামর্শ দিলেন। আমি তা পারব না, আমি তা দেখতে পারব না যে আমার মা হাসপাতালে যাবে।

সেই দরিদ্রার কথাতে দারুণ বেদনা বেজে উঠল। সে কেঁদে ফেললে। তার এক হাতে লণ্ঠন, আর হাত দিয়ে সে চোখের জল মুছছিল। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় তার অসম্বৃত ঘোমটাটা ক্ষণেকের জন্য অল্প অপসৃত হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি সে আবার মুখ ঢাকলে। চকিতে মুখের যেটুকু আবছায়া দেখতে পেলাম, তাতে মনে হ'ল সে অনুপমা অপরূপ সুন্দরী! আমি তার ত্রস্ত বেশবাস থেকে স্খলিত ভূলুণ্ঠিত ওড়না গুটিয়ে তুলে দিতে গেলাম, তার হাতে হাত ঠেকল—সে কী কোমল, কী মসৃণ!

হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পুলিনা বললে সে পথ ভুলেছে। আমিও ত' এখানে নতুন, আমিও ত' পথ চিনি না। এত রাত্রে কাকে পথ জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। পুলিনা শীতে ও ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপছে। আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখি একটা কালোয়ারের দোকানে আলো জ্বলছে—কতকগুলো লোক বসে মদ খাচ্ছে। আমি পুলিনাকে দাঁড়াতে ব'লে সেই শুঁড়ির দোকানে পথের উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করতে গেলাম। তারা আমাকে পথ ব'লে দিলে। আমি ফিরে আস্‌ছি, দূর থেকে একটা ধস্তাধস্তির অস্পষ্ট শব্দ শুন্‌তে পেলাম; তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দেখতে পেলাম একটা লোক এক হাতে পুলিনার কোমর জড়িয়ে আর এক হাতে পুলিনার উৎক্ষিপ্ত হাত চেপে ধরে তাকে টান্‌ছে—আর একটা লোক পিছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে বল্‌ছে—'আরে পিয়ারী, নারাজ কেঁও, চলো চলো দিলসাদ!' সেই দুই মাতালের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে পুলিনা ছটফট

করছে। আমি ছুটে এসেই সজোরে মার্লাম এক ঘুষি যে লোকটা পুলিনাকে জাপ্‌টে ধরেছিল তার নাকে। যে-লোকটা পুলিনাকে ঠেলছিল সে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিতে দিতে চীৎকার ক'রে সঙ্গীকে ডেকে গেল—'আরে রামাইয়া ভাগরে ভাগ্, বাঙালীন্‌কা বাঙালী আয়া, আভি বোম্ মারেগা।' সে লোকটা নাকের উপর যে বায়না পেয়েছিল তারই চোটে পুলিনাকে ছেড়ে দিয়ে বন্ধুর উপদেশ ক'রে শিরোধার্য তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করলে। ছাড়া পেয়েই পুলিনা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধর্‌লে। সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ্‌ছিল। আমি তাকে বাহুবেষ্টনে আগলিয়ে ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম, সে তখনো ভয়ে অভিভূত হয়ে থরথর করে কাঁপছিল, তার মুখে কথা সর্‌ছিল না, আমি ধরে না থাক্‌লে সে হয়ত মাটিতে পড়ে যেত, তারদেহ এমনি শিথিল অবশ হয়ে পড়েছিল।

আমি তাকে সাহস দেবার জন্যে বললাম—ভয় কি? আমরা ত তোমার বাসার কাছে এসে পড়েছি।

আমার কথায় চেতনা পেয়ে সে এক ঝটকায় আপনাকে আমার বাহুবেষ্টন থেকে মুক্ত ক'রে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত স্বরে বললে—'আপনাকে আর আমার সঙ্গে আস্‌তে হবে না।' আমি বিরক্ত হয়ে বললাম—'তবে আমাকে এতটা পথ টেনে নিয়ে এলে কেন?' তারপরেই মিষ্ট মৃদু স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—'আমাকে বিশ্বাস কর, আমার কোনো কু-মতলব নেই, সব পুরুষ এক রকম নয়।' আমি আমার অজ্ঞাতসারে তার হাত চেপে ধর্‌লাম। সে তৎক্ষণাৎ ছিনিয়ে নিয়ে বললে—'আমাকে মাপ করুন, আপনাকে কষ্ট দিয়ে এতটা পথ অনর্থক ঘুরিয়ে আন্‌লাম; আমি মিনতি করছি, আপনি চলে যান, আমাকে ছেড়ে দিন'।

একটু আগেই দুজন বর্বর পুরুষ তার উপর যে অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল তাতেই ভয় পেয়ে সে আমাকেও আর বিশ্বাস করতে পারছে না। বুঝতে পারলেও তার অবিশ্বাসে আমার মনে আঘাত লাগল। ফণীর দেওয়া টাকা দুটি নিয়ে তাকে দিতে যেতেই মনে পড়ল এই সামান্য সাহায্যে ওর কিই বা হবে? আমার কাছে যে নোটখানা ছিল, তাইতে মুড়ে টাকা দুটি পুলিনার হাতে দিলাম; পুলিনা নোটখানাকে মনে করলে কাগজ—তবু তাই নিতে তার হাত কেঁপে উঠল, তার গলা কেঁপে গেল, সে অস্পষ্ট মৃদু স্বরে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কি বললে শুনতে পেলাম না! সে চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে বললাম—'আর একটা কথা; তোমার মা ভালো হয়ে উঠবেন, কিন্তু আরো কিছুদিন কিছু দরকার হতে পারে; রোজ রোজ পথে পথে ফেরা তোমার সাজে না; তুমি যদি দয়া ক'রে হপ্তায় হপ্তায় এই বারে সন্ধ্যার সময় যমুনার পুলের ধারে আস, তাহলে আমি তোমার মায়ের তত্ত্ব জেনে যেতে পারি। কেমন আস্‌বে? সে কি বলবে কিছুক্ষণ স্থির করতে পারছিল না। শেষে অনেক ভেবে বললে—'আচ্ছা।' আমি খুশী হয়ে আবার কি বলতে যাচ্ছিলাম। সে তা শোনবার অপেক্ষা না ক'রে একটা গলির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ঘুম ভেঙে সকাল বেলা উঠে মনে হ'ল রাত্রের সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন। কিন্তু ফণী এসে তার বন্ধুত্বসুলভ উপদ্রব বিদ্রূপ ক'রে আমার সকল সন্দেহ মোচন করলে। রাত্রের ঘটনা এমনি আরব্য উপন্যাস ঘেঁষা যে সকল-কথায়-সন্দিহান আমার বন্ধুকে সে-সকল ব্যাপার বলতে আমার মন সরল না। আজকাল আমরা এত অতিরিক্ত সভ্য হয়ে উঠেছি যে পাছে লোকে বোকা দুর্বল ভাবে এই ভয়ে অসৎ

কাজের সফলতার মিথ্যা গর্ব কর্‌তেও আমাদের বাধে না। কাল রাতে যে আমি নিষ্ফল হয়ে ফিরেছি এই লজ্জা যে শুধু ফণীর বিদ্রূপেই আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল তা নয়, আমার অন্তরেও কেমন একটা ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছিল—হায় হায়! একটি বার তার মুখখানাও দেখে নিতে পার্‌লাম না! এই সাধুপনা, এই নিশ্চেষ্ট সংযমের ফল কি! যাকে বারো-বারোটা টাকা অক্লেশে দিয়ে এলাম তার মুখখানা দেখতে চাওয়ার অধিকার আমার বর্তেছিল বৈ কি। কিন্তু যখন আবার সেই তরুণী ভিখারিণীর সমস্ত আচরণ মনে ক'রে দেখলাম যে সে কী ভদ্র, তার সর্ব-কার্য কী মহিমাময়, তার কথা কী মার্জিত, তখন আমার নিজের সংযমের ওপর রাগ অনেকটা কমে গেল। মানুষের কণ্ঠস্বরে তার বংশ-শিক্ষা-সহবতের পরিচয় স্পষ্ট পাওয়া যায়; ঐ তরুণী ভিখারিণী তার মিষ্ট স্পষ্ট স্বল্পবাক্যে তার সৎ বংশ, সুশিক্ষা আর ভব্য সঙ্গের পরিচয় দিয়ে গেছে—সে কখনো নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোক হতে পারে না। তার অতি সাধারণ মোটা অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিপাটি পোষাকে একেবারে আচ্ছন্ন-ক'রে-ঢাকা মূর্তিখানি সমস্ত দিন আমার মন জুড়ে রইল।

পরদিন আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে আমার নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে হতে লাগল—তার নাম জানি না, পরিচয় জানি না, ঠিকানা জানি না; সে যদি আবার নিজে দয়া ক'রে যমুনার পুলের ধারে আসে তবে তার দেখা পাব, আর তাও সেই সাত দিন পরে। এই সাত-সাতটা দিনে যে ১৬৮ ঘণ্টা, ১০ হাজার ৮০ মিনিট, ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৮শ সেকেণ্ড! আমি আস্‌ছে শুক্রবার পর্যন্ত নিমেষ গুণতে লাগলাম; আমার মনে হতে লাগল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র ধ্যেয় আরাধ্য বস্তু সেই যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী!

অবশেষে, অনেক অপেক্ষার পর, শুক্রবার এল। আমি কত রকম ছল ক'রে সন্ধ্যাবেলায় ফণী ও অন্যান্য আলাপীদের কবল থেকে আমাকে মুক্ত ক'রে সেই অপরিচিতার সাক্ষাতের জন্যে রওনা হলাম। অধৈর্যের ব্যগ্রতায় জোরে হেঁটে অন্ধকার হবার আগেই যমুনার পুলের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তখনো সে আসেনি দেখে মন বিরস বিরক্ত হয়ে উঠল। অস্থির হয়ে চঞ্চল পদে ঠাণ্ডী সড়কে বেড়াতে লাগলাম। আমি মনে মনে সঙ্কল্প আঁটলাম যে আজ যেমন ক'রে হোক তার মুখ দেখতে হবে। মনে হতে লাগল আজ তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে, ভদ্র ঘরের ভদ্র মেয়ে কি না আজ ঠিক বোঝা যাবে। হাজার বার ঘড়ি দেখার পর আটটা বাজল—আটটার সময় তার আস্‌বার কথা। আমি চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে তার আসার পথের দিকে চেয়ে রইলাম, সে-পথে একটি লোকেরও সমাগম নেই ; সেই সবুজ ওড়নার আভাসও দূরে দূরান্তে দেখা যাচ্ছে না। অপেক্ষার মুহূর্তগুলি অনন্ত যন্ত্রণার। তেমনি কষ্টকর মুহূর্ত জুড়ে জুড়ে সাড়ে আটটা বেজে গেল। তখন আমার মন অধীর নিরাশ হয়ে পড়ছে, ভাবনা হচ্ছে 'আচ্ছা বোকা ত' আমি ! বারো-বারোটা টাকা পেয়ে গেছে সে, আর কি সে এ পথ মাড়াবে ! সে হয়ত এতক্ষণ আমার দয়ালুতার বোকামি নিয়ে কত হাসিই হাস্‌ছে।' হঠাৎ পথের আলোর নীচে একটা সবুজ রং চলে আস্‌তে দেখা গেল। বুকটা নেচে উঠল, নিঃশ্বাস উতলা হয়ে উঠল, শরীর ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল। আমি ছুটে চল্‌লাম—সেই, সেই ঐ !

হাত বাড়িয়ে আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বল্‌লাম—তুমি এসেছ ? আমি মনে করেছিলাম তুমি আর এলে না।

সে আমার হাতের আগ্রহ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে নমস্কার

কর্‌লে। মনে হ'ল আমার ব্যগ্রতায় তার হৃদয় ব্যথিত মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। সে ভাবগদ্‌গদ কোমল স্বরে বল্‌লে—আমি উপকারী বন্ধুকে শুধু কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছি, আজ আর তাঁর সহৃদয় দয়ার উপর জুলুম কর্‌তে আসিনি। আপনি যে অমূল্য দান সেদিন দিয়েছেন তাই আমাদের আশাতীত। রুগ্ন মায়ের প্রার্থনা আর আশীর্বাদ, আর কৃতজ্ঞ মেয়ের আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে জানিয়ে যেতে এসেছি!

আমি বললাম—ওসব কথা শুনতে চাইনে। তোমার মা কেমন আছেন বল শুনি।

সে উৎফুল্ল হয়ে বললে—আশা হয়েছে, মন নিচ্ছে, তিনি এ যাত্রা বেঁচে উঠবেন। ডাক্তার এখনো ঠিক কিছু বলতে পার্‌ছেন না, কিন্তু মাকে আমি ওষুধ পথ্য দিতে পেরেছি, তিনি একটু বল পেয়েছেন; জগতে এখনো দয়ালু ভালো লোক আছেন জেনে তাঁর প্রাণে বল এসেছে। আপনিই আমার মাকে বাঁচালেন। আমরা আপনার দয়ায় চিরঋণী!

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—সেদিন তুমি বাড়ী গেলে তোমার মা কী বললেন?

পুলিনা লজ্জিতা হয়ে বলতে লাগ্‌ল—'আমার দেরী দেখে মা বড় ভাবছিলেন, হাজার রকম বিপদের আশঙ্কা ক'রে আকুল হচ্ছিলেন— তিনি ত' আমাকে সহজে একলা বাড়ীর বার হতে দিতে চান্‌নি। আমি তাঁকে সব ব'লে আঁচল খুলে দেখালাম আমি কি পেয়েছি— নোট আর টাকা! দেখে তিনি অবাক হয়ে—'

পুলিনা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে থেমে গেল, কথা শেষ কর্‌তে পারলে না।

আমি বল্‌লাম—মা কিছু মন্দ ভেবেছিলেন বুঝি ?

পুলিনা সরলভাবে পরিষ্কার কথায় বললে—না, তিনি জানেন আমি ত' খারাপ নই, তিনি কিছু মন্দ ভাববেন কেন ? মা অবাক হয়ে থেকে বললেন—যে বাবুটি এত দিয়েছেন তিনি দেবতা !

আমি হেসে বল্‌লাম—মোটেই না। কিন্তু যা দিয়েছিলাম তাতে ক'দিন চলল, আর কি আছে ?

সে উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠল—আছে, আছে, এখনো আছে। কিন্তু তার প্রফুল্লতা ছাপিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়্‌ল।

আমি সঠিক জানবার জন্যে জেদ ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু কত আছে ?

সে বললে—মায়ের ওষুধ পথ্য কিনেছি, এক মাসের ঘরভাড়া দিয়েছি, তবু এখনো কিছু আছে।

আহা ! এদের ব্যয় কত স্বল্প ! বারো টাকা থেকে ওষুধের দাম দিয়েছে, মায়ের পথ্য কিনেছে, এক মাসের ঘরভাড়া শুধেছে, সাতদিনের খোরাকী চলেছে, এবং তারপরও কিছু আছে !

আমি বল্‌লাম—আমি ঠিক জান্‌তে চাই, তোমার হাতে কত আছে ?

সে মনে আঘাত পেয়ে বিরক্ত হয়ে এক পা পিছিয়ে গিয়ে বল্‌লে—দেখুন মশায়, আমি আপনার মন গলিয়ে টাকা আদায় কর্‌তে আসিনি।

আমি তার কাছে সরে গিয়ে নম্র স্নেহার্দ্র স্বরে বল্‌লাম—তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। তোমার মন এখন অভিমানে এমন চড়া হয়ে আছে যে তুমি একটুতেই অপমান বোধ কর্‌ছ। কিন্তু আমি বাস্তবিক জান্‌তে চাই যে যখন তোমার হাতের শেষ পয়সাটিও খরচ হয়ে যাবে, তখন কি আর কারো কাছে সাহায্য পাবার সম্ভাবনা আছে ?

সে ভয়ার্ত কোমল স্বরে বল্‌লে—না গো না, কিচ্ছু না।

—তবে! তোমার মায়ের অবস্থা মনে কর। আমার শক্তিতে যতটুকু কুলোয় আমাকে তাঁর সাহায্য করতে বাধা দিয়ো না।—এই ব'লে আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে একটু সরে দাঁড়িয়ে তুই হাত জোড় ক'রে নত মাথায় ঠেকিয়ে আমাকে প্রণাম কর্‌লে।

সে আমার অযাচিত দানের স্নিগ্ধ প্রস্তাবে একেবারে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে পড়েছিল, ভাষায় আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ সে পাচ্ছিল না।

আমি সস্নেহে বল্‌লাম—তবে তুমি আমার সঙ্গে আমার বাসায় চল, তোমার মায়ের জন্যে আমি কিছু গরম কাপড়-চোপড় আর খাবার দেবো।

আমি তার হাত ধর্‌লাম ; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে, কিন্তু আমার সঙ্গে নিরাপত্তিতে চল্‌ল। তখন আমার অত্যন্ত খারাপ লাগতে লাগল যে এই তরুণী একজন অপরিচিত পুরুষের বাড়ীতে এত সহজে যেতে রাজি হ'ল। কিন্তু আমার মন খুশী ক'রে তুলে সে হঠাৎ কেঁদে ফেলে ব'লে উঠল—না, না, আমি যেতে পারব না।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—অকস্মাৎ তোমার এ হ'ল কি?

সে তেমনি আবেগের সঙ্গেই আবার বল্‌লে—না না, আমি যাব না, আমি যেতে পার্‌ব না।

আমি কপট ক্রোধ প্রকাশ ক'রে বল্‌লাম—আঃ, তুমি একজন ভদ্রলোককে এইটুকুও বিশ্বাস করতে পার না? তোমার মায়ের জন্যে, নইলে আমি এক্ষনি চলে যেতাম। তোমার আচরণ আমাকে আঘাত কর্‌ছে, অপমান কর্‌ছে।

সে দুই হাতে আমার হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে ব'লে উঠল—আমি আপনাকে কষ্ট দিলাম। ভগবান জানেন আমি আপনাকে অপমান করতে পারি না। আমি গরীব, আমি অজ্ঞ, আমি কথা বলতে জানি না, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি এমন দয়ালু, আপনাকে কি আমি অপমান করতে পারি?

তখন আমি তাকে একটু আকর্ষণ ক'রে বললাম—তবে চল। রাত হয়ে যাচ্ছে, অনেকখানি পথ যেয়ে ফিরতে হবে।

সে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে তেমনিভাবেই কাঁদতে কাঁদতে বললে—না, না, আমি কিছুতেই যেতে পারব না।

আমি সান্ত্বনা ও সাহস দেবার জন্যে বললাম—তোমার ভয় কাকে? এখানে তোমায় কেউ চেনে না, কেউ দেখবে না, তবে আপত্তি কিসে?

সে মিনতি ক'রে বললে—দোহাই ভগবানের, আমি আপনাকে মিনতি করছি, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি যেতে পারব না, আমাকে যেতে অনুরোধ করবেন না।

সে থরথর ক'রে কাঁপছিল। আমি তার মায়ের অবস্থা স্মরণ করিয়ে আর একটু পীড়াপীড়ি করলে সে হয়ত আমার সঙ্গে অগত্যা যেত, কিন্তু তার অবস্থা দেখে আমার দয়া হ'ল। আমি বললাম—তবে কি হবে? আমি ত' সঙ্গে বেশী কিছু আনতে পারিনি।

সে অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চোখের জল মুছে আপনাকে একটু সামলে নিয়ে বললে—গরীবের ওপর আপনার অসীম দয়া, তাই একটা অনুরোধ করতে সাহস করছি—আমাদের আপ্ত বন্ধু আর কেউ নেই!

তার মিনতিতে ব্যথিত হয়ে বললাম—কি বলবে বল, আমাকে তোমাদের বন্ধু ক'রে নাও।

সে কুণ্ঠিত হয়ে বল্‌লে—আমাকে যদি খানিকটা লংক্লথ কিনে এনে ছান, তাহলে আমি রুমাল তৈরী ক'রে বেচতে পারি।

আমি খুশী হয়ে বল্‌লাম—বেশ, আমি কালই এনে দেবো।

সে আঁচল থেকে খুলে একটি আমার টাকা আমার হাতে দিতে এল।

আমি বল্‌লাম—টাকা! টাকা কি করব?

সে কুণ্ঠিত হয়ে বললে—কাপড়ের দাম, এ আপনারই দেওয়া টাকা।

আমি ব্যথিত বিরক্ত মুগ্ধ হয়ে বল্‌লাম—ও টাকা তোমার কাছে থাক, আমি কিনে এনে দেব।

সে অধিকতর কুণ্ঠিত হয়ে মিনতি ক'রে বল্‌লে—আপনার দয়া অসীম, কিন্তু আমাদের নেবার ক্ষমতা অল্প। আপনাকে এই টাকাটি নিতে হবে।

আমি অত্যন্ত প্রীত হয়ে তার সেই অতি-দুঃখের টাকাটি গ্রহণ কর্‌লাম। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার মায়ের ওষুধ পথ্য চলবে কিসে?

সে মৃদু স্বরে বল্‌লে—আপনি যদি কাল কাপড় কিনে এনে দ্যান, পরশুই রুমাল হয়ে যাবে। তরসু আপনি দয়া ক'রে কোনো দোকানে বেচে এনে দিতে পার্‌বেন কি? তাহলে এ তিন দিন কোন রকমে চলে যাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর?

—তারপর? রুমাল বেচে যে লাভ হবে তাই দিয়ে আবার খানিকটা কাপড় কিনে এনে দেবেন। এমনি ক'রে একদিন অন্তর এক ডজন রুমাল বেচতে পারব। মা ভালো হয়ে উঠলে

আমরা দুজনে মিলে খাটতে পারব, তখন আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

এই দারুণ দৈন্যদশাতেও তার আত্মনির্ভরতা আর আত্মসম্মান-বোধ আমাকে মুগ্ধ ক'রে ফেললে। আমি আমার পকেট থেকে সুতোর ফুলে আমার নাম লেখা একখানা খুব ভালো কাজ-করা রুমাল বার ক'রে বললাম—এমন রুমাল তৈরী করতে পার?

সে ব্যগ্র হয়ে রুমালখানি হাতে ক'রে নিয়ে রাস্তার লণ্ঠনের আলোর নীচে ধরে দেখে বললে—এর চেয়ে ভালো পারি। এটা কি আপনার নামের আদ্য অক্ষর?

আমি হেসে বললাম—হ্যাঁ, আমার নাম বিমল। আমার রুমাল ফুরিয়ে গেছে; এমন রুমাল কলকাতা ছাড়া পাওয়া যায় না; তুমি আমাকেই খানকতক রুমাল আগে তৈরী ক'রে দেবে, নমুনাটা তোমার কাছেই থাকুক।

সে খুশী হয়ে দুই হাতে সেই রুমালখানি ধরে মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার ক'রে বিদায় নিতে উদ্যত হ'ল। আমি তার হাত ধরে থামিয়ে বললাম—তোমাকে আমার জন্যে আর একটু কাজ করতে হবে।

সে আনন্দিত হয়ে বল্‌লে—আপনার কোনো কাজ করতে পেলে আমি ধন্য হব। বলুন, কি করতে হবে!

আমি হেসে বললাম—ফাঁকি দিয়ে ত' আমার নামটি তুমি জেনে নিয়েছ, এখন তোমার নামটি বল। আমার এই যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীটিকে আমি কি ব'লে ডাকব?

সে খুশীর দ্বিধায় চঞ্চল হয়ে উঠে বল্‌লে—আপনি আমাকে যে নাম দিলেন তার চেয়ে মিষ্টি নাম আমার মা আমাকে দিতে পারেননি। আমি আপনার কাছে 'যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী' হয়েই থাকব।

আমি সঙ্কোচের সহিত মৃদু স্বরে বললাম—নাম ত' বললে না, তবে রাহুর মতন তোমার ঐ ঘোমটাটি মোচন ক'রে তোমার মুখখানি একটিবার আমায় দেখতে দাও! তোমার মুখের হাসির আগুন সাক্ষী ক'রে আমাদের বন্ধুত্ব পাকা হোক! আজকের সন্ধ্যাটি স্মরণীয় হোক।

আমি তার ঘোমটা খুলে দিতে গেলাম। সে আমার বিস্তারিত ব্যগ্র হাত এড়িয়ে ঘোমটা চেপে ধরে সরে দাঁড়াল। সে যেন নিজের ইচ্ছার উপর জোর ক'রে ইচ্ছাকে দাবিয়ে রেখে বললে—আপনার দয়ার বাঁধনেই আমাদের বন্ধুত্ব পাকা হয়ে গেছে; আপনার অহেতুকী দয়া আজকের সন্ধ্যাটিকে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। আপনার একটি অনুরোধও আমি রাখতে পার্‌লাম না ব'লে দুঃখিত হচ্ছি; যে দয়া আপনার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, তিনিই আপনাকে এই অক্ষমাকে ক্ষমা করতে বলবেন। মা আমাকে ঘোমটা খুলতে দিব্যি দিয়ে বারণ করেছেন। আমার মুখ দেখবার মতন নয়। কালো কুৎসিত। আপনি দেখতে চাইবেন না।

তার এই মধুর বচনবিন্যাস, ইচ্ছাগর্ভ অনিচ্ছা, তার এই ভঙ্গুর বাধা আমার মনকে পাগল ক'রে তুললে। সত্যই যে মেয়ে কুৎসিত সে কখনো এমন ক'রে নিজের কদর্যতা বর্ণনা করতে পারত না। আমি ক্ষিপ্তের মত তার ঘোমটা ধরতে গেলাম। সে ফস্‌ ক'রে পাশ কাটিয়ে চঞ্চল প্রজাপতির মত ওড়না উড়িয়ে হাওয়ার ওপর দিয়ে যেন ভেসে চলে গেল—দূর থেকে ব'লে গেল—কাল আসবেন।

আমি আবার স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সর্বাঙ্গে তখন রক্তকণার ঝুমঝুমি বাজছে! সে পঞ্চাশ কদম এগিয়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আমায় দেখলে। আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি

দেখে সে হাত নেড়ে ব'লে গেল—যান যান, রাত হ'ল বাড়ী যান ; কাল সন্ধ্যাবেলা আসবেন।

সমস্ত রাতদিন আমি তারই ভাবনা ভাবতে লাগলাম—সে কোন্ শ্রেণীর লোক ? যতই তার সুশিক্ষিত মহিলার ন্যায় কথাবার্তা, ভদ্র ঘরণীর মত চাল-চলন মনে পড়তে লাগল ততই তাকে বড় ঘরের লেখাপড়া-জানা মেয়ে ব'লে ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগল। অন্তত তার বংশের পরিচয়টাও জানতে হবে, এ সঙ্কল্প দৃঢ় করলাম ; এবার তার ঘোমটার মত এ পরিচয়টিও অনুদ্‌ঘাটিত থাকতে দেব না।

সন্ধ্যা হয়ে এল। তোমার মনে থাকতে পারে ফণী, সেদিন আমরা আলফ্রেড পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমি ফেরবার জন্যে উতলা হয়ে উঠলাম ; তুমি কিছুতেই তখন ফিরবে না। আমি যত জেদ করি তোমার গোঁ তত বেড়ে গেল ; তুমি কিছুতেই এলে না, আমি তোমার তিরস্কার শুন্‌তে শুন্‌তে একলাই চলে এলাম—তুমি মনে করেছিলে আমি পড়ব ব'লে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরছি, তাই তুমি আমাকে ভালো ছেলে, বুক-ওয়ার্ম ব'লে ঠাট্টা করতে লাগলে, আমি মনে মনে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেলাম—পড়তে নয়, সেই আমার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর সঙ্গে দেখা করতে। সে যেন আমাকে নেশার মত আকর্ষণ করছিল। সে আমাকে কাপড় কিনতে একটা টাকা দিয়েছিল ; আমি চক্ থেকে পাঁচ টাকার কাপড় কিনে নিলাম। আজ সে আমার যাবার আগেই এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি আসিনি দেখে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ; আমাকে আসতে দেখেই ছেলেমানুষের মতন উল্লসিত হয়ে উঠল ; সে আনন্দে অনর্গল বকে যেতে লাগল ; যেন আমি তার কত আপনার, কত দিনের পুরাতন পরিচিত বন্ধু।

আমি তার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ভালোর দিকে যাচ্ছেন না বটে, কিন্তু অবস্থা আর খারাপও হয়নি, থমথমে হয়ে আছে। তাতেই তার কত আনন্দ! আশায় তার মন ভরে উঠেছে! এবার আর মায়ের ঔষধ-পথ্যের অভাব ঘটবে না!

ওর মায়ের কথার প্রসঙ্গে আমি ওদের বংশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে তার বাপ জমিদার ছিলেন। কিন্তু মিতাচারী ছিলেন না। মা দুর্দশায় পড়ে কিছুদিন জিনিসপত্র বেচে সংসার চালিয়েছিলেন; তারপর কায়ক্লেশে সংসার চলছিল। তার মা তাকে লেখাপড়া, শিল্পবয়ন, গানবাজনা, ছবি-আঁকা, অনেক বিদ্যা শিখিয়েছেন, তাইতে সেও মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারত। কিন্তু দুঃখে দারিদ্র্যে মায়ের শরীর ভেঙে পড়াতে তার মা ত' উপার্জন করতে পারেনই না, সেও মায়ের সেবার পর আর বেশী সময় পায় না। অনশনে মৃত্যু ভিন্ন আর কোনো উপায় তাদের ছিল না। এমন সময় আমার দেখা ইত্যাদি।

আমি বললাম—তোমার মা তোমায় নানা বিদ্যা শিখিয়েছেন, যেটুকু সময় পাও তা দিয়ে ত' তুমি উপার্জন করতে পার।

সে বললে—হাঁ, কোনো ভদ্রঘরের মেয়েদের শেখাবার কাজ নিলে রোজগার হয় বটে; কিন্তু আমার বয়স অল্প ব'লে মা বেশীক্ষণ কাছ-ছাড়া করতে চান না; মায়ের যে রকম অসুখ তাতে তাঁকে ছেড়ে থাকাও আমার সম্ভব নয়। আর কেই বা সন্ধান ক'রে আমাকে চাকরী জুটিয়ে দেবে? এমন নির্বান্ধব অবস্থা আমাদের চিরকাল ছিল না।

সে কেঁদে ফেললে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তার ঘোমটা খোলবার চেষ্টা করলাম। সে ঘোমটা চেপে ধরে পাশ কাটিয়ে

সরে দাঁড়াল। আজকেও তার মুখ দেখতে পেলাম না। সে মিনতি ক'রে আমায় তাকে ঘোমটা খুলতে অনুরোধ করতে বারণ করলে।

আজ থেকে আমাদের রোজই দেখা হতে লাগল। সে রুমাল ক'রে এনে দেয়, আমি সেগুলি নিজেই নিয়ে রুমালের দামের দ্বিগুণ টাকা তাকে দিয়ে আসি—কতক টাকায় কাপড় কিনে নিয়ে যাই, কতক দিন খরচের জন্যে নগদ দিই।

সে অবাক হয়ে রোজই সন্দেহ করে—রুমাল এত দামে কেমন ক'রে বিকায়; লাভের অল্প টাকায় অতখানি কাপড় কেমন ক'রে মিলতে পারে! আমি রুমাল বেচার আড়াল দিয়ে তাকে বেশী বেশী টাকা দিচ্ছি ব'লে সে আমাকে তিরস্কার করে, আমার কাছ থেকে টাকা নিতে অস্বীকার করে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিই যে আমিও প্রায় তাদের মত গরীব লোক, তাতে ছাত্রাবস্থা, অত সস্তা টাকা আমার নয়। অমন সুন্দর রুমাল মহার্ঘ হবারই ত' কথা!

আমার রুমাল দেখে ফণীরও সখ হ'ল ঐ রকম রুমাল কিনবে। সে আমার সঙ্গে চকে যেতে উদ্যত। আমি অনেক কষ্টে ওকে নিরস্ত ক'রে বললাম যে আমি একদিন কিনে এনে দেবো, এ তৈরি পাওয়া যায় না, ফরমাস দিয়ে তৈরি করাতে হয়। পুলিনাকে সেদিন রেশমী কাপড় দিয়ে ফণীর নাম-লেখা রুমাল তৈরি ক'রে দিতে অনুরোধ করলাম। অপরের ফরমাস পেয়ে পুলিনা খুশী হয়ে উঠল—যাক্, তা হলে রোজ রোজ আমিই শুধু তার রুমাল কিনে ক্ষতিগ্রস্ত হব না!

ফণী ত' সে রুমাল দেখে মহাখুশী। তারপর থেকে তার আর ফরমাসের অন্ত রইল না; রেশমী গলাবন্ধ, নেকটাই, টাকা পয়সা রাখবার থলি, টুপি, দস্তানা, মোজা, রেশমের চেন, বালিসের ওয়াড়ে

কারুকার্য, বিছানার চাদরের কারুকার্য, বিছানা-ঢাকা সুজনি, পাতুক্ষে, জাজিম, টেবিলক্লথ, পরদা, যা-না-তা যত রাজ্যের জিনিস তার দরকার হয়ে উঠল। আমি পুলিনাকে দিয়ে সেই সব তৈরি করিয়ে করিয়ে ফণীর কাছে চতুর্গুণ দামে বেচতাম। কে এমন নিপুণ শিল্পী ওস্তাদ কারিগর জিজ্ঞাসা করলে বলতাম সে একটা বুড়ো মুসলমান খলিফা! তার ইয়া পাকা দাড়ি! বুড়ো মুসলমান খলিফার বর্ণনা শুনে ফণী আর কখনো তাকে দেখতে যেতে চাইত না।

ফণী বিমলের বর্ণনায় বাধা দিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—উঃ! কি জোচ্চোর তুমি! পাছে তোমার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীকে দেখতে চাই ব'লে বন্ধুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছিলে। আমার সে সব জিনিস এখনও আছে। যূথি সে সব দেখে জিজ্ঞাসা করছিল, আমি কোথায় পেলাম। আমি কি জানি ছাই, যে তুমি অমন মিথ্যাবাদী? আমি ওকে বলে দিলাম এলাহাবাদে একটা বুড়ো খলিফার তৈরি। আরে ছ্যাঃ! বলতে হয় যে তরুণীর হাতের তৈরি; তাহলে যত্ন ক'রে রাখতাম! এখন আর যত্ন করবার জো নেই, যুথিকা ঠাকরুণের অমনি ঠোঁট ফুলবে!

সকলে যূথিকার দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। যূথিকা একবার করুণ কাতর দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জিত বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখ নত করিল।

বিমল বলিতে লাগিল—এখন থেকে পুলিনাকে দেখা যেমন আমার নেশা হয়ে পড়ল, আমাকে দেখতে আসাও তার তেমনি নেশা হয়ে পড়ল। আমি তাকে যতই শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, স্নেহ দেখাতে লাগলাম, সেও তত আমার কাছে সহজ সরলভাবে তার মন খুলতে লাগল—কিন্তু মুখ খুললে না একদিনও! সে একদিন অকপটে স্বীকার করলে

যে আমাদের মিলন-সন্ধ্যাটির দিকে সে ব্যগ্রমনে সমস্ত দিন তাকিয়ে থাকে ; অনুক্ষণ আমার কথাই তার স্মরণ হয়। হায়! আমারও যে সেই দশা !

আমাদের এগজামিনের সময় নিকট হয়ে এল, এবার কলকাতায় ফিরতে হবে। আমার মন ভেঙে পড়তে লাগল। উৎসাহ কমে আসতে লাগল, আমার হৃদয়লক্ষ্মীকে ছেড়ে সরস্বতীর আরাধনা তুচ্ছ মনে হতে লাগল। এক একবার মনে হতে লাগল চুলোয় যাক্ এগজামিন, আমি প্রয়াগ ছেড়ে কোথাও যাব না। ফণীকে বললাম যে, এবার আমার ভালো তৈরি হয়নি, এগজামিন এবার দোবো না। যে বরাবর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে এসেছে, তার এই ওজর ফণী হেসেই উড়িয়ে দিলে।

ফণী হাসিয়া বলিল—আমি তোমার সতীর্থ হলেও আমি তোমার ছাত্র ছিলাম ; রোজ যখন তোমার সঙ্গে পড়তাম তখন ত' দেখতাম কী গভীর, কত বিস্তৃত তোমার জ্ঞান,—তোমার খোঁড়া ওজরকে আমায় ডিঙিয়ে চলে যেতে দেবো কেন ? তারপর ? তোমাকে ত' আমি জোর ক'রে টেনে কলকাতায় নিয়ে গেলাম, তোমার হঠাৎ এমন নিশ্চেষ্টতা এল যে তোমার বাক্সে জিনিস ভরা, বিছানা বাঁধা সব আমাকেই তখন করতে হয়েছিল। এতদিনে এখন তার কারণটা টের পাওয়া গেল। একটা ভিখারী মেয়ের প্রেমে নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করতে বসা !

বিমল ফণীর কথায় কান না দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল—যাবার তিন দিন আগে আমি পুলিনাকে কলকাতা যাবার কথা বললাম। সে চমকিত হয়ে, স্তম্ভিত হয়ে গেল, তারপর একে-বারে কান্নার ঝড়ে ভেঙে পড়ল। আমি বললাম, যাবার আগে আমি

একবার তোমার মাকে প্রণাম ক'রে যেতে চাই। তাঁকে অনুমতি দিতে অনুরোধ জানিয়ো।

সে স্বীকার ক'রে গেল। পরদিন সে খবর দিলে—মা বললেন তাঁর স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁর যে বিক্ষোভ হবে তা সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হতে পারে; এইজন্যে সাক্ষাতের বাসনা পরিত্যাগ করতেই তিনি আপনাকে অনুরোধ করেছেন।

আমি দিনের বেলা পুলিনাকে তার মায়ের পাশে বাড়ীতে ঘোমটা-খোলা অবস্থায় দেখতে পাবার আশাতেই তার মাকে দেখতে যাবার প্রস্তাব করেছিলাম, তাই আমি আবার তাকে অনুমতি চাইতে অনুরোধ করলাম। সে রাজি হয়ে গেল। আর ব'লে গেল, তার ঘোমটা মোচন ক'রে আমাকে দেখা দেবার অনুমতির জন্যে জোর ক'রে জেদ ক'রে তার মাকে সে ধরে বসবে।

আজ আমাদের মিলনের শেষ দিন, বিদায় নেবার শেষ মিলন! এই দিনটি আমার মর্মে মুদ্রিত হয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলা তার দেখা পেয়েই প্রথম প্রশ্ন করলাম—মায়ের অনুমতি পেয়েছ?

সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে ল্যাম্প-পোষ্ট থেকে দূরে একটা ছায়ানিবিড় নিমগাছের অন্ধকার তলায় দাঁড়িয়ে অশ্রুতে ভারি স্বরে শুধু বললে—হ্যাঁ! তারপর সে নিজের হাতে ঘোমটা খুলে ফেললে। একি তার অসম্পূর্ণ দান! মুখ যদি খুললে তবে অন্ধকার রাত্রির ঘন-পল্লব নিমগাছের নিবিড় ছায়ার ঘোমটার তলে কেন? এ তার মায়ের উপদেশ—এ তারই অসম্পূর্ণ অনুমতির কৌশল! পথের লণ্ঠনের আলো পত্রপুঞ্জের ফাঁক দিয়ে একটি ক্ষীণ রশ্মি পাঠিয়ে শুধু তার চিবুকটিকে ঈষৎ আলোকিত করেছিল। সে কী শুভ্র, কী নিটোল,

কী সুন্দর! চিবুকের মাঝখানের টোলটি, অধরের নীচের খাঁজটি কি সুসমঞ্জস তরঙ্গিত রেখায় ফুটে উঠেছিল! সেই ক্ষীণ আলোকের ঈষৎ আভায় তার মুখের যতটুকু আভাস পেলাম তাতেই আমার মন ভাবরসের মাধুর্যে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল; সেই চাঁছা-ছোলা টিকলো নাকটি, লজ্জার হাসিমাখা পাতলা ঠোঁট দুখানি, গোলাপের পাপড়ির মতন গাল দুটি, আর শাঁখের মতন শুভ্র বর্তুল গ্রীবাটি, সেই তন্বীর ললিত-লাবণ্যভরা হিল্লোলময় দীর্ঘ ঋজু তনুরই উপযুক্ত! আমি মুগ্ধ অবাক হয়ে সেই অন্ধকারের মাণিকের দিকে চেয়ে রইলাম—উদ্দাম ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে টেনে লণ্ঠনের কাছে নিয়ে যাই। লজ্জায় বাধল। যেটুকু পেয়েছি পাছে তাও হারাই সে ভয়ও হ'ল। অবাক অপলক দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম!

সে লজ্জা-সুখে-জড়িত মৃদু মর্মর স্বরে বললে, তোমার পায়ে পড়ি, রাগ কোরো না। মা কিছুতেই অনুমতি দিচ্ছিলেন না, আমার কান্না দেখে মা এই সর্তে রাজি হলেন। আমার প্রথমে বড় রাগ হচ্ছিল, কিন্তু মা যে যুক্তি দিলেন তাতে আমি বুঝলাম যে তিনি ঠিকই বলেছেন।

পুলিনা আজ আমাকে আপনা হতেই তুমি ব'লে সম্বোধন করলে। আমি খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার মায়ের যুক্তিটা কি শুন্‌তে পাই?

সে ব্যাকুল বিষণ্ণ কাতর স্বরে বললে—তুমি আমাদের চিরস্মরণীয়। কিন্তু একটা ভিখারী মেয়ের কথা তোমার কদিনই বা মনে থাকবে? আর কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, যদি বা হয়, আমায় তোমার চিন্‌তে পারা উচিত হবে না!

আমি ব্যথিত হাসি হেসে বললাম—তুমি কি মনে কর তোমার

মুখ স্পষ্ট দেখতে পাইনি ব'লে আমি তোমায় চিনতে পারব না? তোমার হাত-পা, দেহের গড়ন, চলা-বলা, সব যে আমার মর্মে মর্মে গেঁথে গেছে, শুধু মুখ না দেখলেই চিনতে পার্ব না?

সে বললে—মা ত' বললেন যে মুখ না দেখলে লোককে চেনা যায় না।

আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে ব'লে ফেললাম—তবে তোমার মা প্রেমের মর্ম জানেন না; প্রেম ত' চোখ দিয়ে দেখে না, প্রেম যে প্রাণ মেলে দেখে! প্রাণের পরিচয়—সে যে অন্ধের দৃষ্টির মতন, না দেখেও সব দেখতে পায়, সে যে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে, সে কি শুধু চোখের ওপর নির্ভর ক'রে চুপ ক'রে থাকে? তোমাকে আমি যেখানে যতটুকু দেখতে পাব, তাতেই চিনতে পারব।

এই কথা শুনে সে কেঁদে ফেললে। আমার হাত চেপে ধরে বললে—না না, আমার মত একজন সামান্য ভিখারিণীর সঙ্গে তোমার পরিচয় থেকে কাজ নেই। আর আমাদের দেখা হবে না!

আমি তাকে বুকে টেনে নিলাম। সে সুখে-দুঃখের ভারে অভিভূত হয়ে নেতিয়ে পড়ল, তার তন্বী দেহখানি বসন্ত-সমীরণের স্পর্শে বেতস লতার মত থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। আজ সে আমার বাহুপাশ এড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করলে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আর দেখা হবে না কেন ভাবছ? এগজামিন হয়ে গেলেই আমি তোমার কাছে ছুটে আসব।

মনে হ'ল সে যেন অশ্রুজলে গলে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সে ক্রন্দনকম্পিত কণ্ঠে বললে—আমার কেমন মনে নিচ্ছে, এই শেষ! এই শেষ! আমার মা আর বেশী দিন বাঁচবেন না। মা মারা গেলে আমি কোথায় দাঁড়াব? আর যদিই বা মা বেঁচেই থাকেন

তোমার মনে আমার মতন ভিখারিণীর কথা কদিনই বা বেঁচে থাকবে?

তার নিরাশা-কাতর মর্মবেদনা আমারও মর্ম স্পর্শ করেছিল। আমি শপথ ক'রে তাকে আশ্বাস দিলাম যে জীবনে কখনো আমি তাকে ভুলব না। আমি হিসাব ক'রে ওকে বললাম যে অমুক দিনে আমার এগজামিন শেষ হবে; সেই রাত্রেই আমি রওনা হয়ে চলে আসব, তার পরদিন যেন সে এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে। আমার আঙুল থেকে আংটি খুলে তার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে বললাম, এই আমার অঙ্গীকার রইল। তুমি সেদিন আসতে ভুলো না যেন।

সে তার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি আমার মুখের দিকে তুলে বললে—তোমাকে আমি কেমন ক'রে ভুলব? আমি আসব, যতদিন বেঁচে থাকব রোজ আসব; কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার দেখা এই—এই শেষ!

আমি আর আপনাকে সম্বরণ করতে না পেরে তার অধরে একটি প্রগাঢ় চুম্বন করলাম। তার সর্বাঙ্গ সুখের হিল্লোলে কেঁপে উঠল, কিন্তু সে অত্যন্ত লজ্জিত কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন নিজেকে লুকোতে চাইলে। আমি তার হাতে বটুয়া ক'রে একশ টাকা দিলাম। সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের ভিতর আরো সরে এল।

তারপর সে আস্তে আস্তে সরে দাঁড়াল। আমি বললাম—এখন আসি!

বিদায়-মুহূর্তে সেই ভীরুকেও সাহসী ক'রে তুললে, সে ছুটে এসে দুই হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে পরম আবেগে আমাকে একটি চুম্বন করলে। আমি আবার তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। সে

আমার বাহুপাশ এড়িয়ে ভীরু পাখীর মত ছুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দূর থেকে শুধু তার কান্না-ভাঙা কথা শুনতে পেলাম—এই শেষ বন্ধু, এই আমাদের শেষ!

সেই আমাদের শেষ। এগজামিন দিয়ে ফিরে গিয়ে তাকে কত খুঁজলাম, তাকে আর দেখতে পেলাম না; যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর সংবাদ কেউ আমাকে দিতে পারলে না। সেই অবধি আমি তারই সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরে মরছি।

বিমলের কাহিনীর মধ্যে এমন একটি অকপট সত্য ব্যথা প্রকাশ পাইয়াছিল যে সকল শ্রোতার মনেই তাহার স্পর্শ লাগিয়াছিল—বিশেষ করিয়া মেয়েদের। অমরের স্ত্রী ও ভগিনী অঞ্চলে অশ্রুমার্জন করিতেছিল, আর যূথিকা ত' ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। উৎসবের এ কী করুণ অবসান!

কেবল ফণীর মনে বেদনার ছায়া পড়ে নাই। সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ভাগ্যে-ভাগ্যে ডাইনির হাত থেকে বেঁচে গেছ দাদা! Thank your stars, you lucky dog! তুমি চিরকাল ধূর্ত আমি জানি। মুখে মুখে কল্পনায় আচ্ছা উপন্যাস বানিয়ে শোনালে। বোকা মেয়েগুলোর রকম দেখ না! কেউ চোখ মুছছেন, কেউ নাক ঝাড়ছেন, আর যূথিকা ত' রীতিমত ভেউভেউ করছে—যেন সে সদ্য বিধবা হয়েছে! সাবাস তোমার কল্পনা আর কবিত্বকে ভাই! এ নিশ্চয় তুমি কোনো ইংরিজি নভেল থেকে না-ব'লে গ্রহণ করেছ!

বিমল মর্মাহত বিরক্ত হইয়া বলিল—ফণী, জেনো, আমি সত্য ছাড়া বলিনে। এ সত্য।

ফণী বিজ্ঞের অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—ঈশ্বর করুন এ

যেন সেই এলাহাবাদের বুড়ো মুসলমান খলিফার মত সত্য হয়। তবে সত্য একটু আছে বৈকি—নিত্যি তুমি ছুঁড়ির বাড়ী যেতে এটা ঠিক ; তাই থেকে এই উপন্যাসটি খাড়া করেছ। রচনা খাসা হয়েছে—এ আমাকে মানতেই হবে।

বিমল রাগে লাল হইয়া উঠিল। তাহাতে আবার যখন দেখিল যে যূথিকা তাহার স্বামীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। বিমলের মনে হইল, যূথিকাও তাহার স্বামীর কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে বুঝি অবিশ্বাস করিতেছে। সে নিজেকে নারীসমাজে হেয় হইতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—ফণী, আমার কথার একবর্ণও মিথ্যা নয়।

ফণী হাতের উপর হাত চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল—তাহলে ত' আরো আফশোষের কথা! দুর্বল দয়ায় শ' দুই টাকা অপাত্রে দিয়ে দিলে, আর তার বদলে পেলে কি ছাই! এমন বোকাও মানুষে হয়?

এই বিদ্রূপাত্মক মমতা শুনিয়া অমর ও তাহার ভগ্নীপতি হাসিয়া উঠিল। বিমল বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবে বলিয়া উঠিয়া পড়িল ; এমন সময় এক অদ্ভুত বিপদ উপস্থিত। বিমলকে উঠিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া যূথিকাও মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার স্বামীকে কি যেন বলিতে গিয়া সে একেবারে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

সকলেই ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠিল ; সকলে একসঙ্গে হুড়াহুড়ি করিয়া তাহাকে তুলিতে গেল ; অমরের স্ত্রী ও ভগিনী ছুটাছুটি করিয়া জল ও পাখা আনিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ফণী কিন্তু স্ত্রীর মূর্চ্ছায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তর্জন করিতেছিল—উঃ! মাগীগুলোর মূর্চ্ছা

যাওয়া একটা ফ্যাশান! চাবকে রোগ সারিয়ে দিতে হয়! ঢং! সর তোমরা, আমি ওকে এক লাথি মারলেই এক্ষণি ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠে পড়বে!

অল্পক্ষণ পরে যুথিকার জ্ঞান হইল। সে আপনার ঘরে যাইতে চাহিল। স্ত্রীলোকেরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গেল। তাহারা তাহাকে নানা-প্রকার উপদেশ দিতে লাগিল,—কাহার ভাসুর-ঝির মূর্চ্ছা হইত এবং কোথায় স্বপ্নাদ্য মাতুলি ধারণ করিয়া একেবারে সারিয়া গিয়াছে; কাহার কবে কোথায় কেমন করিয়া মূর্চ্ছা হইয়াছিল, এবং মূর্চ্ছার সময় কি করা উচিত ইত্যাদি। অবশেষে সকলে একবাক্যে সাব্যস্ত করিল যে সমস্ত দিন রৌদ্রে ছুটাছুটি করিয়া ও আগুন-তাতে থাকিয়া মাথা গরম হইয়া অমনটা হইয়াছিল।

ফণী অভ্যাগতদের শান্ত করিবার জন্য বলিল—আরে এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই আমাদের—আজকালকার মেয়েদের এ একটা ফ্যাশান দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে—বোধ হয় ওটা ওদের মান্ধাতার আমলের ব্যাধি, নইলে ইন্দুমতী ফুলের ঘায়ে মারা যেত না। আজকাল আবার একটা কৃত্রিম ভব্যতার ভাব জেগে উঠেছে, স্পষ্ট কথা বলবার জো নেই। যা মনে এল বললাম, অমনি গিন্নির মন গরম হয়ে মাথা গরম হয়ে গেল, আর বিমল ত' একেবারে মারমুখো। তোমার ভাই বিমল, মেয়েমানুষের চেয়ে একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকা উচিত ছিল।

ফণী যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া শেষ কথাটি বলিল সে তখন তাহার কথা শুনিবার জন্য সেখানে ছিল না। বিমল নিজের ও সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনে কেবলই হইতেছিল— যুথিকাও আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না? তবে গল্প

শোনবার সময় সে বার বার অমন ব্যথাভরা করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইছিল কেন? তবে সে আমার দুঃখের কাহিনী শুনে অমন ফ্যাকাসে হয়ে কাঁপছিল কেন, শেষে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লই বা কেন? সে কি তবে স্বামীর বন্ধু ব'লে আমাকে একটু প্রীতির চক্ষে দেখে? তার স্বামীর রূঢ় হৃদয়হীন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আমার ব্যথায় সেও ব্যথিত হয়েছিল? সে দাঁড়িয়ে উঠে কি বলতে যাচ্ছিল—কি সে কথা যা বুকে বিঁধে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল?

বিমল ব্যথিত আগ্রহে তাহার প্রেয়সীর স্মৃতিকে উদ্দেশ করিয়া ভাবিতে লাগিল—হৃদয়হীনদের সম্মুখে তোমার কথা ব্যক্ত ক'রে আমি তোমাকে অপমান করেছি, আপনাকে অপমান করেছি, বিশ্বের কাছে অজ্ঞাত আমাদের গভীর অন্তরের নিগূঢ় প্রণয়কে অপমান করেছি! এই বর্বরেরা সূক্ষ্ম ভাবের মর্যাদা বুঝবে কেমন ক'রে? ওগো আমার ভিখারিণী, তুমি তোমার দারিদ্র্যের মধ্যে যে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছ, তার মর্যাদা বোঝা এই সব ধনী বর্বরদের সাধ্য নয়। কোথায় তুমি, ওগো কোথায় তুমি! সেই যে সন্ধ্যাগুলি তোমার বন্ধুকে অমৃতের আস্বাদ জানিয়েছিল তা কি তোমার কাছেও অমর হতে পেরেছে—মনে কি পড়ে বন্ধু, তোমার এই পরিতপ্ত উপহসিত বন্ধুকে?

বিমলের চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। হৃদয়ের গোপন গুহায় সে এতকাল যে দুঃখ-চুয়ানো অশ্রু অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার বাঁধ আজ ভাঙিয়া বন্যা আসিয়াছে।

প্রভাতে উঠিয়া বিমল স্থির করিল এ বাড়ীতে থাকা আর নয়। এখানে এখন নিত্য পদে পদে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইবে; যাহা পবিত্র, পূজার সামগ্রী, তাহাকে মলিন হইতে দেখিতে হইবে। এ বাড়ীতে আর নয়।

এমন সময় ফণী সেই ঘরে আসিল—লজ্জিত অপ্রস্তুত। সে কুণ্ঠিত অনুযোগের স্বরে বলিল—কাল রাত্রে তুমি খেলে না কিছু। আজ এখন পর্যন্ত জল খেতে গেলে না। তুমি নিশ্চয় আমাদের ওপর রাগ করেছ। তুমি ত' ভাই আমার স্বভাব জানো, আমার ব্যঙ্গ দমন ক'রে রাখা কঠিন। তবে তুমি রাগ করছ কেন? আমাকে ক্ষমা কর। আর, তোমার কাছে বলতে কি, কাল অমরদের সঙ্গে একটু বেশী মদ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অমন উৎসবটা আমা হতে একদম মাটি হ'ল, তাই আমার যথেষ্ট শাস্তি। তার উপর তুমি রাগ ক'রে আমার জীবনটাকে বিস্বাদ ক'রে তুলো না ভাই! তুমি আমার একমাত্র বন্ধু! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বিমল বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে ফণীর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—কথাটাকে এখন চাপা থাকতে দাও, আর উস্কে তুলো না। আমি ও-সম্বন্ধে আর কিছু বলতে বা শুনতে চাইনে। কাল আমি আমার তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ব, আমার এখানে থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে।

ফণী মোটেই ভাবে নাই যে বিমল চলিয়া যাইতে চাহিবে। মর্মাহত হইয়া বলিল—আবার পাগলামি করে! আমি একটু ঠাট্টা করেছি ব'লে তুমি আমার বাড়ী থেকেই চলে যাবে! না, তা হবে না। তুমি ত' স্বীকার করেছ অমৃতবাবু বর্মা থেকে না আসা পর্যন্ত এখানে থাকবে। তোমার কারো কাছে কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ ঘটেনি। কাল যারা উপস্থিত ছিল তারা সকলেই তোমার পক্ষ হয়ে আমাকেই যাচ্ছেতাই বকেছে, তারা আমাকেই দুষেছে! তবে তুমি পালাতে চাচ্ছ কেন ভাই?

বিমল এই প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—তোমার স্ত্রী কেমন আছেন?

ফণী উৎফুল্ল হইয়া ভদ্রভাবেই বলিয়া উঠিল—সেরে উঠেছে। সে ভয় পেয়েছিল পাছে আমাদের মধ্যে একটা বড় রকম ঝগড়াঝাঁটি বেধে যায়। সে তোমার জলখাবার সাজিয়ে বসে আছে, খাবে এস, —লক্ষ্মীটি কথা শোন, এস। অমরেরা চলে যাচ্ছে, তারাও দেখা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

বিমল বিরক্তভাবে বলিল—চল।

ফণী এত সহজে বিমলের সঙ্গে ভাব করিতে পারিয়া খুশী হইল। সে তাহাকে স্ত্রীর জিম্মায় রাখিয়া অমরদের নৌকাতেই আপন মহাল তদারকে চলিয়া গেল।

বিমল ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে তাহার মনটাই বিরস বিষণ্ণ হইয়াছে বলিয়া সমস্ত বিরস বিষণ্ণ লাগিতেছে, না বাস্তবিক অপরেও আজ বিরস বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সে জল খাইতে গিয়া দেখিল যুথিকার ভাবটি যেন দুর্যোগের প্রভাতের মত দেখাইতেছে। সে যে হাসি দিয়া বিমলকে অভ্যর্থনা করিল তাহা বড় মিষ্ট, বড় প্রীতি-গর্ভ, কিন্তু বড় ক্লান্ত, বড় ক্লিষ্ট করুণ! যূথিকা কল্যকার ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র করিতেছে না দেখিয়া বিমলের ভালো লাগিতেছিল না। সে যে যূথিকার বন্ধুত্ব মহামূল্য মনে করে; যূথিকা যদি তাহাকে অন্যায় করিয়া উপেক্ষা করে তাহা ত' সে নীরবে সহ্য করিতে পারিবে না। সে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—না বান্ধবী, এমন ক'রে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে আমি দেবো না আপনাকে। বিশ্বসংসার আমাকে যা খুশী ভাবুক, আমি গ্রাহ্য করিনে। আপনি আমাকে ভুল বুঝলে আমার সহ্য হবে না। যারা নিজেরা কু, তারা আমাকে কু ভাবলে আমার মনে লাগবে না, কিন্তু যিনি নিজে পবিত্র সুন্দর, তিনি আমাকে কুৎসিত ভাবলে যে বুকে বাজবে। আপনি

আমাকে ভুল বুঝলে আমার সহ্য হবে না। যারা নিজেরা কু, তারা আমাকে কু ভাবলে আমার মনে লাগবে না, কিন্তু যিনি নিজে পবিত্র সুন্দর, তিনি আমাকে কুৎসিত ভাবলে যে বুকে বাজবে! আপনি আমার কাহিনী শুনে কি ভেবেছেন, আমি আপনার মতটি শুনতে চাই।

যূথিকা অনেকক্ষণ অবাক-দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার বড় বড় সুন্দর টানা চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল; সে আবেগকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল—আমি কি ভেবেছি বিমল-বাবু? যদি সমস্ত সংসার আপনার কথা মিথ্যা ব'লে সাক্ষ্য দেয়, তবু আমি জানবো যে আপনি সত্য কথাই বলেছেন। আপনি জানেন না যে আমি আপনাকে কতখানি জানি।

বিমল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—আপনি যে আমাকে অবিশ্বাস করেননি সে আপনি নিজে পবিত্র সুন্দর ব'লে। আপনার শপথ ক'রে আমি আবার বলছি আমি যা বলেছি, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়, বানানো নয়।

যূথিকা একটু লজ্জায় কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—সেদিন আপনি কথায়-কথায় আমাকে জানতে দিয়েছিলেন যে আপনি একটি মেয়েকে ভালোবাসেন; সে কি ঐ আপনার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী?

বিমল ম্লান মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সেই! আপনি আমার মরীচিকার আরাধনা দেখে হাসবেন না; এই ছায়ার পিছনে ছুটতে ছুটতে আমারই নিজেকে অনেক সময় পাগল ব'লে মনে হয়, আমার ভাবের আবেগ যুক্তিতর্কের আলোয় ধরে দেখলে নিজেরই হাসি পায়—কিন্তু হৃদয় যে আমার কিছুতেই মানে না। যাকে চিনি না, যে আমাকে ভালোবাসে কি না জানি না—

যূথিকা বিমলের কথার মধ্যে হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—সে আপনাকে খুব ভালোবাসে!—কথাটা বলিয়াই লজ্জিত হইয়া মৃদু-স্বরে তাহার কথার লাগাড়েই যেন বলিতে লাগিল—ব'লেই ত' মনে হয়। সেই সংসারের চাতুরীতে অনভ্যস্ত তরুণী মেয়েটি আপনার অমন সদাশয় স্নেহ পেয়ে কি চুপ ক'রে থাকতে পেরেছে। আপনার বর্ণনা শুনে ত' মনে হয় যে সে আপনার ভালোবাসায় ডুবে গিয়েছিল—আমরা মেয়েমানুষ, পুরুষদের চেয়ে মেয়েমানুষের মনের ভাব ভালো বুঝি।

বিমল উন্মুখ হইয়া যূথিকার কথা শুনিল। তাহার আশ্বাসে বিমলের হৃদয় আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিতে লাগিল—আমিও আমাকে ঐ ব'লে প্রবোধ দিয়ে থাকি, কিন্তু মন যে মানে না! যাকে ভালোবাসা যায় তার মুখ থেকে বার বার ভালোবাসি শুনেও মানুষের তৃপ্তি হয় না। শুধু অনুমানে আমার মন যে ভরে না, তার জন্যে কি মনকে দোষ দেওয়া যায়? তাকে ভুলতে কত চেষ্টা করেছি, সেই চেষ্টা আমাকেই শুধু পাগল ক'রে তুলেছে। সেই সুন্দরী ভিখারিণীর আধেক-দেখা মূর্তিখানি আর পূর্ণব্যক্ত অন্তরটি আমার মনের সাম্‌নে ভেসে উঠেছে, আর-একটিবার তাকে দেখবার জন্যে আমার সমস্ত জীবন উন্মুখ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। আপনি আমার ব্যথা বুঝেছেন, আপনার কাছে মমতা পেয়েছি, আপনার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই—আমার সমস্ত পরমায়ু আর ভবিষ্যৎ-জীবনের সমস্ত সুখের সম্ভাবনার বিনিময়ে তাকে দেখতে পাওয়ার একটি মুহূর্ত যদি আমি পাই ত' আমি আর কিছু চাইনে। আমি ত' সেই দুর্লভ মুহূর্তটির সন্ধানেই আমার জীবনটাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি। আমি ত' তারই জন্যে—

'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর !
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর !'

পথে পথে ঘাটে ঘাটে তাকে খুঁজেই সমস্ত দিন কাটে। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে গভীর রাত্রে ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে যখন বিছানায় পড়ি, তখন কল্পনা করি যেন সেই আমার সাধনার দুর্লভ দেবতা দুঃখের হোমানলে আমার জীবন আহুতি পেয়ে প্রসন্ন হয়ে বরাভয় মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়েছেন ; আমার পূজা ব্যর্থ হবে না, আমি আমার দেবতাকে পাব—এ আমার অন্তর বলতে থাকে। তারপর যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন তাকে আমার বুকের মধ্যে স্বপ্নরূপে পেয়ে সকল বেদনা ভুলে যাই। আবার যখন ঘুম ভাঙে তখন দ্বিগুণ ব্যাকুলতায় তারই সন্ধানে ছুটে চলি। বৌঠাকরুণ, আপনি আমার পাগলামি শুনে মুখ ফেরাচ্ছেন—আপনিও কি আমার ব্যথা বুঝ্ছেন না ?

যূথিকা কোনো উত্তর করিল না, মুখ ফিরাইয়াই বসিয়া রহিল ; সে মুখ ফিরাইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ উঠিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। বিমল অবাক হইয়া তাহার যাওয়ার দিকে তাকাইয়া রহিল—ভাবিতে লাগিল, যূথিকার কাছে পুরুষ হইয়া প্রণয়ের বেদনা ব্যক্ত করাতেই কি সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল ?

একটু পরেই যূথিকা একখানি মেঘদূত হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার মূর্তি বড় বিষণ্ণ, বড় গম্ভীর। সে বইখানি বিমলের হাতে দিল, কিন্তু কিছু বলিল না। বিমলের তখন পড়িবার প্রবৃত্তি ছিল না, সে বই হাতে করিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পড়ুন। সেই একটি কথাও উচ্চারণ করিতে তাহার স্বর কাঁপিয়া উঠিল, সে শব্দ যেন চোখের জলে সাঁতার দিয়া আসিয়াছে।

বিমল পড়িতে আরম্ভ করিল—প্রথমে অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে

থামিয়া থামিয়া ; পড়িতে তাহার মন লাগিতেছিল না। পড়িতে পড়িতে যখন প্রাণের সুরে লেখার সুরে মিল হইল তখন বিমল কবির কথায় নিজের মনের প্রতিধ্বনি করিয়া উৎসাহে পড়িতে লাগিল। সে পড়িতে পড়িতে দেখিতেছিল যূথিকার হৃদয় তাহার প্রতি মমতায় কবির কথায় দোল খাইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে চোখে জল ভরিয়া উঠিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে তার কণ্ঠ বাষ্পাকুল হইয়া ভরিয়া উঠিতেছে, তাহার উজ্জ্বল সুন্দর চোখ তুটি হইতে করুণার আলো ক্ষরিত হইতেছে। ইহাতে ফল হইল এই যে বিমল আপনাকে কিছুতেই হাল্কা প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে পারিল না, এবং যূথিকাও আর অন্য কথা পাড়িবার অবসর পাইল না।

কত বেলা পর্যন্ত এই পড়ার আবরণে হৃদয় উদ্‌ঘাটনের ব্যাপার চলিয়াছে তাহার দিকে কাহারও খেয়াল নাই। হঠাৎ দাসী আসিয়া খবর দিল ঠাঁই করা হইয়াছে, ভাত বাড়া হইয়াছে।

ফণী কখন ফিরিবে তার ঠিক নাই। বিমল একাকী ক্লান্ত বিষণ্ণ মন লইয়া কোথাও স্থির হইতে পারিতেছিল না। সে নিজের স্বস্তি-শান্তি-গ্রাসী চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। নদীর ধারে বাঁধা পাড়ের শেওলা-ঢাকা ঢালুর উপরে গিয়া শুইল ; সেই ছায়াশীতল মনোরম স্থানটিতে শুইয়া থাকিতে থাকিতে বিমল শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্নরাজ্যের প্রবেশ-তোরণের বাহিরে তাহার সমস্ত তুঃখবেদনা পড়িয়া রহিল ; সে-দেশে সমস্ত মধুস্মৃতি গলাইয়া যে মোহিনী মূর্তি গড়া হইল তাহা যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর। কোমল স্বরে তাহার কানে সুধা বর্ষণ করিয়া সে বলিতেছিল—'তোমাকে, আমি কেমন ক'রে ভুলব ? আমি আসব, যত দিন বাঁচব রোজ আসব।' বিমল তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া

বলিতে লাগিল, "ওগো নিষ্ঠুর, এ কি তোমার খেলা। এই মুহূর্তটির জন্যে যে আমার সমস্ত প্রাণ অপেক্ষা করে ছিল!" তারপর যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীকে শাস্তি দিবার জন্য সে যেমন তাহার মুখের ঘোম্‌টা খুলিয়া ফেলিয়া চুম্বন করিতে যাইবে অমনি চমকিয়া দেখিল, ঘোম্‌টার ভিতরে ফণীর মুখ! ফণী ভিখারিণীর ছদ্মবেশে তাহাকে ঠকাইয়াছে এবং ফণীর এই ঠাট্টা দেখিয়া বাগানের বুড়ো মালীটা হাসিয়া লুটালুটি খাইতেছে। বিমল কাঁদিয়া ফেলিল, সে আপনার অসহ্য বেদনায় মনের মধ্যে আর্তনাদ করিতে লাগিল। সে সান্ত্বনা পাইবার জন্য ছবিখানিকে বুকে চাপিয়া ধরিল; অমনি ছবির মূর্তি সজীব ও প্রমাণ হইয়া উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল, সে অনুভব করিল সেই ছবি তাহাকে চুম্বন করিয়া তাহার বুকের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

স্বপ্নের মধ্যে যেমন কখনো কখনো মনে হয় যে আমরা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিয়াছি, কিন্তু তখনো বাস্তবিক স্বপ্নই দেখি, বিমলেরও তেমনি বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার প্রেয়সীর সেই বিলম্বিত আবেগ-ভরা চুম্বনে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে—সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল একখানি যেন ফুটন্ত গোলাপের মত সুন্দর চেনা মুখ তাহার উপরে আনত হইয়া আছে, তাহার সুরভি-শ্বাস তাহার মুখে আসিয়া লাগিতেছে। পাছে এই স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় এজন্য বিমল জোর করিয়া চোখ মুদিল; কিন্তু চোখ মুদিয়াই সে বুঝিল যে সে বাস্তবিকই জাগিয়া আছে। তখন সে আবার চোখ মেলিল—দেখিল একটি লম্বা ছিপ্‌ছিপে তরুণী দেহ তার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর মতই নীল শাড়ীর উপর সবুজ ওড়না জড়াইয়া লঘু ক্ষিপ্ত পদে লতাকুঞ্জের আড়ালে মোড় ফিরিতেছে!

অদৃশ্য হইবার পূর্বে একবার সে ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া গেল। বিমল আশ্চর্য হইয়া দেখিল যে তাহার মুখের উপর তেমনি নিবিড় ঘোমটা। তখন আবার মনে হইল সে ঘুমাইয়া আছে, স্বপ্নই দেখিতেছে কিন্তু বারবার চোখ মুছিয়া, চোখ মুদিয়া, চোখ চাহিয়া, নদীজলের কলকল, পত্রপুঞ্জের ঝরঝর আর পাখীর কাকলি শুনিয়া সে আর আপনাকে ঘুমন্ত মনে করিতে পারিল না। কিন্তু জাগিয়াও তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার মনপ্রাণ ছাইয়া তাহার প্রেয়সীর স্মৃতি যেন মূর্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছে—সেদিনের সেই ক্ষিপ্ত চুম্বনের রেশ যেন আজও এখনও তাহার ওষ্ঠে লাগিয়া আছে। বিমল ভীত হইয়া নিজের মনকে বলিয়া উঠিল—ওরে! তবে কি তোর এমন দশাই হ'ল যে জেগেও শুধু তাকেই দেখিস। এ ত' স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, এ যে পাগল হবার পূর্বলক্ষণ! শেষে কি জ্ঞান হারাবি, ক্ষেপে যাবি? কিন্তু স্বপ্ন কল্পনা মস্তিষ্কবিকার কি মাটির উপর পায়ের দাগ রেখে যায়—এই যে মাটিতে বালির বুকে পায়ের দাগ—এ ত' আমার পায়ের দাগ নয়? এও কি তবে মনের ভ্রম? বিমল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল; অমনি দেখিতে পাইল—যেখানে সে শুইয়াছিল সেখানে একখানি পরিপাটি ভাঁজ-করা কাগজ রহিয়াছে। সে আশ্চর্য হইয়া তুলিয়া লইল। খুলিবে কিনা, খুলিয়া পড়া উচিত কি না, এক মুহূর্ত ভাবিল; কৌতূহলের ব্যগ্র তাড়নায় সে আপনাকে নিবারণ করিতে না পারিয়া কাগজের ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল;—কাগজের ভিতর হইতে একটা আংটি বাহির হইয়া তাহার কোলে পড়িল। কাগজে চিঠি লেখা! বিমল আংটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া আগে তাড়াতাড়ি চিঠি পড়িতে গেল—কে লিখিয়াছে, কি লিখিয়াছে, কাহাকে লিখিয়াছে? চিঠিতে লেখা আছে—

বন্ধু আমার, ত্রাতা আমার,—

আমি মুগ্ধ প্রাণের কৃতজ্ঞতার প্রদীপ জ্বেলে নিরন্তর তোমার সঙ্গে ফিরি, অনুক্ষণ আমার প্রীতি তোমায় ঘিরে বিরাজ করে। তুমি আমার সন্ধানে বৈরাগী পথিক দিকে দিকে ছুটে বেড়াও; মিথ্যা বন্ধু আমায় দূরে খোঁজা, আমি যে তোমার নিকটেই থাকি! মনের মাঝে যার বাসা তাকে বাহিরে পাবার আশা ছাড়। অভাগিনী ভিখারিণী, তাকে তুমি কোথাও পাবে না। ভাগ্যদেবতা মিলনপথ আগ্‌লে আছেন, তাঁকে লঙ্ঘন করার সাধ্য নেই। চিরদিন—মৃত্যুরও পরপার পর্যন্ত—আমি তোমায় ভালোবেসে পূজা করব, আর তোমার স্নেহরস স্মৃতির মধ্যে অমর হয়ে ধন্য হব—

তোমারই স্নেহমুগ্ধা
যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী।

বিমলের মনে হইল সে তখনো স্বপ্ন দেখিতেছে; সে আপনার জ্ঞানবুদ্ধিকে প্রত্যয় করিতে না পারিয়া চারিদিকে চাহিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া দেখিতে লাগিল—সে কি এখনো স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে? কিন্তু তাহার চারিদিকে সেই নদী, সেই কুঞ্জ, সেই সুরকি-ঢালা বাঁকা পথ। সেই লাল সুর্‌কির বুকে ছোট পায়ের দাগ, সেই বাড়ী, সবই ত' স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে? ইহাও কি স্বপ্ন? সে কি স্বপ্নের মধ্যেই মনে করিতেছে সে জাগিয়া আছে? বুড়া মালীটা নিড়ানি হাতে করিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। তখন বিমলের স্বপ্নের ভুল ভাঙিল—এ নিশ্চয়ই ফণীর কাণ্ড, সে তাহার দুঃখ-কাহিনী লইয়া এখনো তাহাকে ঠাট্টা করিতেছে, তাহাকে প্রতারিত করিয়া কৌতুক দেখিতেছে। সে জাল চিঠি পাইয়া কি করিতেছে তাহাই দেখিবার জন্য ফণীই নিশ্চয় ঐ বুড়া চরটাকে

উঁকি মারিতে পাঠাইয়াছিল। চিঠিখানা লেখা তবে যূথিকার হাতের। সেও তবে তাহাকে বিদ্রূপ করার ব্যাপারে লিপ্ত আছে! তবে সেই অবগুণ্ঠিতা মূর্তি স্বপ্ন নহে, যূথিকাই তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছিল! বিমল অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়া সঙ্কল্প করিল—এই নিষ্ঠুর বর্বরদের সঙ্গ এই দণ্ডেই পরিহার করিয়া চলিয়া যাইবে! যেমন সে উঠিতে যাইবে অমনই তাহার কোলের ভিতর হইতে চিঠি-হইতে-স্খলিত আংটিটা মাটিতে পড়িয়া গেল। সে উহা হাতে তুলিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেল—ইহা ত' স্বপ্ন নয়, ফণী বা যূথিকার ছলনা নয়, ইহা যে সত্য, ইহা যে খাঁটি! এই আংটি যে তাহার! সে এই আংটি বিদায়ের দিনে যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর হাতে পরাইয়া দিয়াছিল! এই আংটি এখানে কেমন করিয়া আসিল। তবে কি দৈব অতিপ্রাকৃত ঘটনা মানিতে হইবে! না না, এ দৈব নয়, অতি-প্রাকৃত নয়! বিমলের মন ডাকিয়া বলিতেছে—আছে আছে, সে আমার কাছে কাছেই আছে! ওগো আমার অচেনা আত্মীয়, অজানা প্রেয়সী, তোমাকে আমি পাব, পাব—তোমাকে আমি ধরব! বিমল ক্ষিপ্তের ন্যায় আংটিটিকে একবার চুম্বন করে, একবার বুকে চাপিয়া ধরে, একবার মাথায় রাখে, আর উন্মত্তের মত সমস্ত বাগানের কেয়ারির ফাঁকে' ফাঁকে কুঞ্জের মাঝে মাঝে পত্রপুঞ্জের আড়ালে আড়ালে সেই দেখা-দিয়া-অন্তর্হিতা অপ্সরীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। চাকর মালী যাহাকে দেখে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে—'ওহে দেখেছ দেখেছ, একটি তরুণী সুন্দরী নীল শাড়ী আর সবুজ ওড়না পরে এখানে এসেছিল?' সকলে তাহার ব্যাকুল ব্যস্ততা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া চলিয়া যায়, মনে করে রাজাবাবুর বন্ধুর মদের মাত্রাটা আজ কিছু অধিক হইয়া পড়িয়াছে!

সমস্ত বিকাল বেলাটা বাগানময় ছুটাছুটি করিয়া উদ্বেগ-ব্যাকুল চিত্তে বিমল যখন বাড়ীতে ফিরিল, তখন ফণীও বাড়ীতে ফিরিয়াছে। ফণী তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল কেন সে অমন অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে। যূথিকা স্নিগ্ধ স্বরে মমতা ভরিয়া অনুযোগ করিয়া বলিল—যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর জন্যে ভেবে ভেবে শেষে কি আপনি পাগল হবেন, বিমলবাবু?

বিমল বিকারগ্রস্ত রোগীর মত ভাবহীন ঘোলা দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল—অতিপ্রাকৃত ঘটনায় যখন বিশ্বাস করতে বধ্য হচ্ছি তখন আর আমার পাগল হতে বাকি কি?

কালকার ঘটনার পর বিমলের মন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আছে মনে করিয়া ফণী আর কোন প্রশ্ন করিল না। যূথিকা চুপ করিয়া ব্যথিত দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এই অসম্ভব ঘটনার মীমাংসা ও অর্থ খুঁজিয়া বিমল আপনার মন তোলপাড় করিয়া তুলিল; আকাশবাণীর ন্যায় অনিশ্চিত উপায়ে আগত সেই চিঠি শতেকবার পড়িল; কোনো কুলকিনারা পাইল না। বিমল অত্যন্ত চিন্তাকুল গম্ভীর হইয়া রহিল। তবে কি সেই যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী আর ইহ-জগতে নাই। সে পরলোক হইতে তাহার প্রিয়বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে মর্তে অবতরণ করিয়াছিল, স অশরীরী বলিয়া তাহার ছায়ামাত্র বিমলের চোখে পড়িয়া দেখিতে-না-দেখিতে মিলাইয়া গেল? এত লেখাপড়া শিখিয়া, বিজ্ঞান ও ন্যায়ের যুক্তিতর্ক আয়ত্ত করিয়া শেষে কি তাহাকে এইসব আজগুবি কথা মূর্খের মত মানিয়া যাইতে হইবে? যদি না মানে তবে এই ব্যাপারের সম্ভাবনা কেমন করিয়া ব্যাখ্যা করিবে! সে যতই মনে করে এই ব্যাপারের কথা সে কিছুতেই আর মনের মধ্যে আমল

দিবে না, ততই সেই সুন্দরীর অস্পষ্ট-দেখা মুখখানি তাহার মনের সম্মুখে সুস্পষ্টতর হইয়া দেখা দেয়। সেই গোলাপের পাপড়ীর মত গাল দুটি, আফিং ফুলের মতন ঠোঁট দুখানি, শাঁখের মত নিটোল শুভ্র কণ্ঠটি সে যে আবার দেখিয়াছে—তাহাদের ছবি যে তাহার মনের উপর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সে যূথিকার মায়ের ছবিখানি বাহির করিয়া দেখিল—সেই নাক, সেই ওষ্ঠ, সেই চিবুক! এ যে ঠিক তাহার চেনা মুখেরই মতন!

পরদিন দুপ্রহরে আবার সে সেই নদীর ধারে লতাকুঞ্জের কোলে গিয়া শুইয়া রহিল! সে কি আবার আজও আসিবে—এই ভাবনায় তাহার বক্ষ দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। দুপ্রহরের গরম ছায়াশীতল স্থানে নদীর ঠাণ্ডা ভিজা বাতাসের স্পর্শ মিলিয়া তাহার চোখ ঘুমে ভরিয়া আসিতেছিল; সে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে কখন আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

খানিক পরে সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল; একেবারে বিকাল হইয়া গিয়াছে—আজ আর সেই নীল-শাড়ী আর সবুজ-ওড়না-পরা পরীর স্বপ্ন সে দেখে নাই—কোথাও তাহার আবির্ভাবের কোনও চিহ্নও নাই। বিমল আজও তাহার দর্শনের প্রত্যাশা মনের মধ্যে পুষিয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাহার হাসি পাইল; আবার তাহাকে দেখিতে না পাওয়াতেও তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সে আপনার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতে যাইবে, দেখিল তাহার পাশে একখানি ভাঁজ-করা রুমাল পড়িয়া আছে। সে চমকিয়া রুমালখানি কুড়াইয়া লইল—এ ত' তাহার সেই রুমাল যেখানি সে যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীকে নমুনা দিয়াছিল! রুমালের এক কোণে সেই তাহার নামের আদ্য অক্ষর বোনা আছে; অপর কোণে নূতন করিয়া বোনা

আছে, 'বিদায় !—যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী !' এই রুমাল এখানে কেমন করিয়া আসিল ! সে আজও আবার আসিয়াছিল ! আর মূঢ় বঞ্চিত সে সেই দুর্লভ মুহূর্তটিতে কেমন করিয়া ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিল ! সে আজও আবার পাগলের মত ছুটিয়া ছুটিয়া পাতি পাতি করিয়া সমস্ত বাগান, গ্রামের পথঘাট মাঠ খুঁজিল, জনে জনে জিজ্ঞাসা করিল—কেহ কোথায়ও নাই, কেহ কাহাকেও দেখে নাই। সকলে টেপাটিপি করিয়া হাসিল যে রাজাবাহাদুরের বন্ধুটি বিনি পয়সায় খাসা মদ পাইয়া বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতেছে ; দিনকের দিন ওর দশাটা হইয়া উঠিতেছে কি !

বুড়ো মালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে একটু আগে বাগানে মেয়েমানুষের মধ্যে আসিয়াছিল শুধু তাহাদের রাণীমা। বিমল জিজ্ঞাসা করিল—তাঁর কি পরণে ছিল নীল রঙের শাড়ী আর মাথার ঘোমটায় ছিল সবুজ রঙের ওড়না ?

বুড়া মাথা নাড়িয়া—একেবারে ক্ষেপে গেল ! একেবারে ক্ষেপে গেল !—বলিয়া বকিতে বকিতে প্রস্থান করিল।

বিমলের কাছে রহস্য যতই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল সে ততই বিরক্ত হইয়া পড়িতেছিল। যদি কেহ তাহার ব্যথা লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে হয়, তবে তাহারা কিরূপ বর্বর হৃদয়হীন ! কিন্তু এ ত' বিদ্রূপ ছলনা নয়, এই আংটি ও রুমাল যে সত্যের সাক্ষী ! তবে কি সেই যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী এই রূপালি নদীর তীরে এই সোনাতলা গ্রামে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া গা-ঢাকা দিয়া আছে ? যদি তাই হয় তবে তাহার এই নিষ্ঠুর খেলা কি উচিত হইতেছে ? একের কৌতুক, অপরের যে প্রাণান্ত !

বিমল আপনাকে লইয়া এমন বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার চারিদিকেও যে কত কি বিপ্লব ঘনাইয়া উঠিয়াছে তাহার দিকে লক্ষ্য করিবার অবসর তাহার ছিল না। যূথিকার চোখের জল আর শুকাইতেছে না ; তাহার বিষণ্ণ উদাস মুখে সেই প্রসন্ন হাসি আর লাগিয়া নাই। ফণীর কড়া মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ; সে আর পূর্বের মতো যখন-তখন হাসে না, অনর্গল বকে না, গুমটের সন্ধ্যার মত থমথমে গম্ভীর হইয়া আছে। ফণী ছুতায়-নাতায় তাহার স্ত্রীকে কর্কশ ভৎ'সনা করিতেছে—ঘোড়ার দানা খাওয়ানোর সময় যূথিকা দাঁড়াইয়া দেখে না ; বাগানটা চুলায় যাইতে বসিয়াছে তাহার তদারক করে না : রান্না মুখে দিবার জো নাই, রাণীর ননীর শরীর আগুন-আঁচে গলিয়া যাইবার ভয়ে রাঁধুনির হাতে রান্না ছাড়িয়া দিয়া, দাসীর হাতে সঁপিয়া বাবু হইয়া আজকাল কেবল লেখাপড়ার চর্চা চলিতেছে ; যার-তার সঙ্গে কেবল রঙ্গ-রসিকতা করিলে ঘরসংসার বহিয়া যাইতে দেরী লাগে না ইত্যাদি। বেচারী যূথিকা স্বামীর এই সমস্ত অত্যাচার ও বিশ্রী ইঙ্গিত মৌন মুখে সহ্য করিতেছিল ; কিন্তু চক্ষু তাহার শুষ্ক থাকিতেছিল না, সে থাকিয়া থাকিয়া সান্ত্বনা ও সহানুভূতি খুঁজিয়া বিমলের দিকে চাহিতেছিল। তাহার সেই চোরা চাহনি অন্যমনস্ক বিমল দেখিতে পাইতেছিল না বটে, কিন্তু ফণীর নজর এড়াইতেছিল না। ফণীর সঙ্গে যূথিকার চোখো-চোখি যখনই হইতেছিল তখনই ফণী দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক হানিয়া যূথিকাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইতেছিল।

বিমল ফণীর নীরব ও সরব ভৎ'সনা সমস্তই দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল ; কিন্তু সে উহা নিত্যকার নিয়মিত ব্যাপার ছাড়া উহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ধরিতে পারে নাই। সে ফণীর বিরক্ত ও

রূঢ় ব্যবহারের কারণও যুথিকাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। যুথিকা যে ফণী উপস্থিত থাকিলে বিমলের সঙ্গে কথা বলিতেছে না ইহাও বিমল বিশেষ লক্ষ্য করে নাই ; সে মনে করিতেছিল, ফণীর অবিশ্রাম ফরমাসে বেচারা কাজের মাঝে থই পাইতেছে না বলিয়াই কথা বলিবার অবকাশ পাইতেছে না।

কিন্তু হঠাৎ বিমলকে চমকিত করিয়া ফণী রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—দেখ বিমল, আমি কাজের লোক, সমস্ত দিন বাড়ীতে বসে তোমাকে ত' আগলাতে পারি না, কাল তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

বিমল হাসিয়া বলিল—তোমার আমাকে আগলাবার কিছু দরকার নেই, ভাই ; তোমার বাড়ীতে যে লক্ষ্মী আছেন, তিনি কারুর কোনো অভাব রাখেন না।

ফণী রুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, তোমার কাব্যের ছোঁয়াচ লেগে যুথিকার স্বভাব বিগড়ে যাচ্ছে ! কাব্য করতে হয় নিজের মনে কোরো ; রাজার বাড়ীর গিন্নির কাব্য করবার অবসর নেই, তাকে কাজ করতে হবে।

বিমল অবাক হইয়া যুথিকার মুখের দিকে চাহিল। যুথিকা আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। ফণীও হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। বিমল অপ্রতিভ হইয়া ভাবিতে লাগিল—ব্যাপার কি ? ইহাদের কি হইয়াছে ?

পরদিন প্রভাতে সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিমল ঠিক করিল ফণীর সহিত তাহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু—। দুপ্রহর বেলা সেই যে তাহার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী তাহারই সন্ধানে আসিবে হয়ত ! যদি আসে তবে ত' সে হতাশ হইয়া ফিরিবে ! তারপর যদি আর না আসে ? না না, কিছুতেই না, যাওয়া হইতেই পারে না ; ফণী যাহাই

ভাবুক, যাহাই বলুক, সে এ বাড়ী ছাড়িয়া এখন নড়িবে না, নড়িবার শক্তি যে তাহার নাই।

ফণী বিমলকে প্রভাতে বাহির হইতে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হে যাবে না কি?

বিমল লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—না, আমার একটু কাজ আছে।

ফণী অসহিষ্ণুভাবে বুটের উপর জোরে জোরে চাবুক আছড়াইতে আছড়াইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল—যূথিকা!

যূথিকা পাংশুবর্ণ মুখে আসিয়া প্রাণহীন পুতুলটির মত আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

ফণী তেমনিভাবে বুটের উপর অসহিষ্ণুভাবে চাবুক মারিতে মারিতে বলিল—আজ যেন সমস্ত বইগুলো রোদে দিয়ে ঝেড়ে ক্যাটালগ লিখে সাজিয়ে তোলা হয়; ভাঁড়ারে কোন্ জিনিস কত আছে ওজন করিয়ে ফর্দ ক'রে রাখবে; বাগানে কপির ক্ষেতে ঠিক এক ফুট অন্তর চারা চারানো হ'ল কি না দেখবে; ধোবার কাছে লোক পাঠিয়ে কাপড় আনিয়ে মিলিয়ে নিও! ভটচার্যি-গিন্নিকে গিয়ে ব'লে আসবে আমি পরে ভেবে বলব তাঁর ছেলেকে কোন্ চাকরী দেবো……এর কিছু ত্রুটি হলে চাবকে লাল ক'রে দোবো।

ফণী টপাস্ করিয়া ঘোড়ার পিঠে লাফাইয়া সওয়ার হইয়া সমস্ত রাগটা সেই নির্দোষ ঘোড়ার উপর ঝাড়িল। সে অসতর্ক অবস্থায় অপ্রত্যাশিত সজোর চাবুক খাইয়া এক নিমিষে উড়িয়া দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

ফণী যেন বিমল ও যূথিকার প্রাণশক্তি হরণ করিয়া পলাইয়াছে —দুজনেই নিস্পন্দ অবাক রক্তলেশশূন্য!

বিমল আপনাকে জোরে একটা নাড়া দিয়া অবস্থাটা বুঝিতে চাহিল। কেমন সে বর্বর যে অভ্যাগত অতিথির সাম্‌নে নিজের স্ত্রীকে এমন করিয়া অপমান করিতে পারে; আতিথ্যের মর্যাদাও এমন করিয়া লঙ্ঘন করিতে পারে! সে যূথিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—আজকে ওর হয়েছে কি?

যূথিকা চোখের জল রোধ করিতে পারিতেছিল না। সে মুখ না তুলিয়াই নতমুখে বলিল—এ ত' ওঁর চিরকেলে স্বভাব। আপনি আসাতে দিন কতক একটু সাম্‌লে ছিলেন; এখন আবার নিজের অভ্যস্ত স্বভাবেরই পরিচয় দিচ্ছেন; নতুন কিছু নয়।

বিমল ব্যথিত হইয়া বলিল—সর্বনাশ। বারমাস ত্রিশদিন আপনাকে এই তুর্দান্ত স্বেচ্ছাচারীর সঙ্গে ঘর করতে হয়! এত খাটুনির ওপর এত বকুনি আপনাকে সহ্য করতে হয়!

যূথিকা চুপ করিয়া রহিল। বিমলও যূথিকার তুঃখের পরিমাণ ভাবিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে বিমল যূথিকাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল—চলুন, কাব্য আলোচনা করা যাক্‌গে।

যূথিকা স্বামীর ভর্ৎসনা স্মরণ করিয়া লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—আমাকে ক্ষমা করুন! আজ আমার অনেক কাজ করতে হবে, অবসর হবে না।

বিমল উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিল—তা বেশ, ভাঁড়ার খুলে দেবেন চলুন, আমি এক দণ্ডে সব ওজন করিয়ে ফর্দ ক'রে ফেল্‌ছি···

যূথিকা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—ও সব আমাকেই কর্‌তে হবে।

বিমল বলিয়া উঠিল—তবে আলমারির চাবি দিন, আমি ততক্ষণ বইগুলো বার ক'রে রোদে ফেলি······

—না, সে আমার না দেখলে হবে না।

তখন বিমল বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—ভটচার্যি-বাড়ীতেও আপনাকে খবর দিতে যেতে হবে!

যূথিকা অত্যন্ত ব্যথিত কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—না যেয়ে উপায় নেই। না গেলে রক্ষা থাকবে না, আপনি ত' ওর হুকুম শুনেছেন।······কিন্তু ওসব কথা যাকগে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, আমার ওসব অভ্যাস আছে। কিন্তু আপনি দিনকের দিন কেমন বিষণ্ণ নিষ্প্রভ উন্মনস্ক হয়ে পড়ছেন? আপনার সে আনন্দের উচ্ছলতা বন্ধ হয়ে আসছে কেন? আপনার এখানে কি কিছু কষ্ট হচ্ছে? আমাদের ব্যবহারে কি আপনি ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠছেন?

বিমল বিপন্ন হইয়া ইতস্তত করিতে লাগিল! বাগানে যে অসম্ভব আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সে ব্যক্ত করিয়া বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু নিজের দুঃখকাহিনী বারবার পরকে বলিয়া লাভ কি, তাহাতে দুঃখভারে নিপীড়িত যূথিকাকে আরো দুঃখিত করা হইবে মনে করিয়া বিমল আপনাকে সংবরণ ও গোপন করিল। সে বলিল—শরীরটা তেমন ভালো নেই···

যূথিকা সন্দিহান দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। একটা কি কথা তাহার ঠোঁটের উপর প্রকাশের আগ্রহে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু বিমল তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহার মনের ভাব গোপন করিতেছে বুঝিতে পারিয়া সেও তাহার প্রকাশোন্মুখ বাক্যকে ওষ্ঠের কপাট রুদ্ধ করিয়া বন্দী করিল। বিমলের অবিশ্বাস যূথিকার প্রাণে বজিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া বাগানে কপির চারা পোঁতা দেখিতে চলিয়া গেল—বিমলকে সঙ্গেও যাইতে ডাকিল না।

কিছুক্ষণ পরে বিমল বাগানে গিয়া যূথিকাকে খুঁজিল। শুনিল, সে বাড়ীতে ফিরিয়াছে।

বিমল স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া যূথিকাকে খোঁজ করিল। শুনিল, যূথিকা ভট্টাচার্যি-গিন্নির কাছে গিয়াছে।

বিমল যেন কোন্ সম্মোহনের আকর্ষণে ধীরে ধীরে নদীর ধারে লতাকুঞ্জের কোলে শেয়ালা-ঢাকা ঢালু তটের উপর গিয়া উপস্থিত হইল। আশায় আশঙ্কায় তাহার হৃদয় দুরদুর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে স্থির সঙ্কল্প করিল, আজ সে ঘুমাইবে না, মটকা মারিয়া থাকিবে, যাহার বিরহে সে পাগল-পারা হইয়াছে তাহাকে আজ ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইতে দিবে না। সে শুইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, একবার চোখ মুদে আবার মিট্‌মিট্ করিয়া চায়। অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল, কিন্তু আজ ত কেহ কৈ আসিল না! সে হতাশ হইয়া এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু আশা আশঙ্কা উদ্বেগ প্রতীক্ষা প্রত্যাশা সঙ্কল্প মিলিয়া তাহাকে ঘুমাইতে দিল না। সে ক্রমশ হতাশ হইয়া ঘুমের কোলে আপনাকে ধীরে সমর্পণ করিতেছিল, এমন সময় লতাকুঞ্জের পত্রপুঞ্জে মর্মর শব্দ করিয়া উঠিল। সে চোখের পাতা চুল প্রমাণ ফাঁক করিয়া দেখিল দুটি শুভ্র আঙুল কুঞ্জের বেড়ার পল্লবাবরণ ঈষৎ উন্মুক্ত করিতেছে—নিদ্রিতের অবস্থার সন্ধানে কাহার একটি চোখ সেই অবকাশে উঁকি মারিবে!

বিমল আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল, কিন্তু তাহার ভয় হইতেছিল তাহার হৃদয়ের উন্মত্ত অস্থিরতা পাছে সেই ভীরুকে ভয় পাওয়াইয়া ভাগাইয়া দেয়।

মৃদু, অতিমৃদু লঘু সন্তর্পণ পদক্ষেপ কোমল ঘাসের উপর শুনা গেল। বিমল চোখের পাতার ঈষৎ ফাঁক দিয়া কটাক্ষে দেখিল

কুঞ্জদ্বারে দুখানি শুভ্র ছোট পা উঁকি মারিতেছে। কুঞ্জ হইতে ধীরে সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিল সেই ছিপছিপে তন্বী তরুণী—তাহার পরণে আসমানী রঙের শাড়ী, মাথায় ফিরোজা রঙের ওড়না—ঘোমটায় মুখের উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে। মুখের রঙের গোলাপী আভা রাত্রির প্রান্তে উষার মত সুন্দর দেখাইতেছিল। বিমলের অধৈর্য তাহাকে তাড়না করিতেছিল এই দুর্লভ চোরকে বাহুবন্ধনে গ্রেপ্তার করিতে; কিন্তু তাহার কৌতূহল তাহাকে কোনো মতে নিরস্ত করিয়া রাখিতে লাগিল।

সেই ছদ্মরূপিণী তরুণী পা টিপিয়া টিপিয়া সন্তর্পণে আগাইয়া আসিতে লাগিল, এবং যতই সে বিমলের নিকটে আসিতে লাগিল, ততই তাহার মুখের উন্মুক্ত অংশে লজ্জার অরুণিমা গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। সে নিদ্রিতের শিয়রে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া কঠিন দুঃখে বুকভাঙা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, এবং চোখে হাত দিয়া বোধ হয় অশ্রু মার্জনা করিল। তারপর সে নিদ্রিতের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল; বিমল চোখ মুদিল। সেই সুন্দরীর সুরভি শ্বাস তাহার মুখের উপর স্বর্গের অপ্সরীর ন্যায় নাচিতে লাগিল—তারপর উষার অরুণালোক যেমন করিয়া ফুলের উপর পড়ে তেমনি একটি অতীন্দ্রিয় কোমল স্পর্শ আপন অধরে অনুভব করিল।

বিমল আর আপনাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিল না; ফাঁদের ফাঁস হঠাৎ যেমন সুন্দরী বিহঙ্গীকে বন্দী করে, তেমনি হঠাৎ দুই বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিমল সেই পলায়মানা অপ্সরীকে বুকের উপর টানিয়া আনিল, এবং তরুণী ভয়কাতর শব্দ করিয়া তাহার বুকের উপর পড়িয়া গেল। বিমলও ভয় পাইয়া লাফাইয়া উঠিল, অতর্কিত অকস্মাৎ

আক্রমণে ভীরু তরুণীর মূর্চ্ছা হইল বুঝি বা। না, তাহার মূর্চ্ছা হয় নাই, সে আবেগভরে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে! বিমল আনন্দের উন্মত্ত আবেগে তাহার হারানো রত্ন ভালবাসার ধনকে বুকের উপর ফুলের মত তুলিয়া ধরিয়া চুমায় চুমায় আচ্ছন্ন করিয়া আপনাকে যেন নিঃশেষে ব্যয় করিয়া ফেলিতে লাগিল। সে একটু দম লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—অবশেষে, এতদিনে তোমাকে পেলাম, পেলাম আমার ভালোবাসার ধন! তুমি তবে শুধু স্বপ্ন নও! সেই আগের মতনই আমি তোমাকে বুকে অনুভব করছি; সেই প্রণয় আজ শতগুণ হয়ে উঠেছে! আমার সুখের অবধি নেই, আমি জানতে পেরেছি তুমিও আমাকে কত বেশী ভালোবাস!

সেই অর্ধাবৃত মুখের উপর রক্তের ছোপ গাঢ় হইয়া উঠিল; সে কোনো কথা না বলিয়া আপনাকে বিমলের প্রগাঢ় আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিমলের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, সে আর্দ্র স্বরে বলিল—না না, আমি আর তোমাকে বুক থেকে নামাব না, আমি তোমার বিচ্ছেদে বড় দুঃখ সয়েছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ কিছুতে আমাদের এ মিলন ভাঙতে পারবে না,—জীবনে মরণে আমরা আমাদের!—দূর হোক এই মুখের আবরণ, আমার সাধনার ধনকে আমি চিনে নি!

সেই অবগুণ্ঠিতা তরুণী বিমলের ব্যগ্র হাত চাপিয়া ধরিয়া নিবারণ করিতে চাহিল; সে আপনাকে তাহার বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তাহাতে তাহার নিঃশ্বাস বেগে ঘনঘন বহিতেছিল।

কিন্তু এতকালের প্রতীক্ষার পর প্রেয়সী নারীকে বুকে পাওয়ার

পরিপূর্ণ আনন্দের প্রবল আবেগে বিমল সেই অবলার সকল চেষ্টা পরাভূত করিল—একহাতে তাহার তুইহাত চাপিয়া ধরিয়া মুখের আবরণ খুলিয়া ফেলিল। তাহার মুখের উপর বিমলের ব্যগ্র দৃষ্টি পড়িবামাত্র বিত্যুৎবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় সে সেই তরুণীকে ছাড়িয়া দিয়া এক লম্ফে দূরে সরিয়া গিয়া হতাশ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—যূথিকা! তুমি!

বিমলের পায়ের তলা হইতে যেন মাটি সরিয়া গিয়াছে, সে অতল অন্ধকার গর্তের ভিতর অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল ধরিয়া পড়িয়া যাইতেছে, তাহার চারিদিকে সমস্ত বিশ্বব্যাপার উন্মত্ত হইয়া নাগর-দোলায় ঘুরপাক খাইতেছে। সে ব্যাকুল আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—যূথিকা! তুমি!

যূথিকা নিস্পন্দ পাংশু অশ্রুহীন, মলিন হাসি হাসিয়া বলিল—হাঁ, আমিই যূথিকা! যূথিকাই আমি!

বিমলের আগের মুহূর্তের অপার সুখের মায়া মরীচিকার ন্যায় এক নিমিষে মিলাইয়া গিয়াছিল; সে তিক্ত মনের বিরক্ত স্বরে বলিল—ব্যথিতের বেদনা নিয়ে এ ছলনা কি উচিত হ'ল আপনার! আপনার খেলায় আমার যে কী দারুণ ব্যথা লাগল তা কি আপনি বুঝলেন না!

যূথিকার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, তুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

হঠাৎ বিমলের মনে 'বিত্যুৎ-বিকাশের ন্যায় একটা কথা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, সে বলিয়া উঠিল—কাঁদিয়ে কেঁদে কোনো ফল নেই। কিন্তু দয়া ক'রে বলুন—আপনি আমার আংটি, আমার রুমাল কোথায় কেমন ক'রে পেয়েছিলেন?

যূথিকা কোনো কথা বলিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেই লাগিল।

বিমল ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল—বলুন, বলুন, আপনাকে মিনতি করি, আমার আংটি, আমার রুমাল আপনাকে কে দিয়েছিল ?

যূথিকা লজ্জায় এতটুকু হইয়া আপনাকে বিমলের পাশে লুকাইয়া সুখবেদনায় ভরা মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—তুমি।

বিমলের মনের আঁধার কাটিয়া গেল। কিন্তু এ যে তীব্র উজ্জ্বল প্রচুর আলোর অকস্মাৎ বিকাশ! ইহাতে তাহার দৃষ্টি ধাঁধিয়া গেল। সে একটু সহিয়া লইয়া যূথিকার অশ্রুপ্লাবিত নত মুখ তুলিয়া ধরিয়া অগাধ স্নেহ-সম্ভ্রমে দৃষ্টি ভরিয়া স্নিগ্ধ কোমল স্বরে বলিল—"তুমিই যূথিকা, আমার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী! আবার কি আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!" পুলকিত বিমল দুই হাতে যূথিকার লজ্জাকরুণ সুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিল—আমি কী মূঢ়! এতদিন কি চোখ বন্ধ ক'রে ছিলাম। এই ত' সেই নাক, সেই গাল দুটি, সেই চিবুক, সেই মুখ—এ মুখে ত' আমার আজ এই প্রথম চুম্বন নয়!

একটি প্রগাঢ় লালিমার স্রোত যূথিকার মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল; সে আনন্দ-উল্লাস-ভরা দৃষ্টিতে অশ্রুধারার ভিতর দিয়া বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া কোমল অনুরাগ ঢালিয়া দিয়া বলিল—তোমার দয়ার কেনা দাসী আমি। তোমার করুণায় আমার মায়ের শেষ দিন কয়টি নিশ্চিন্ত শান্তিতে কেটে গেছে; তুমি আমাকে পাপে পড়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছিলে; আমি আমার মায়ের মৃত্যু-মুহূর্তের আশীর্বাদ আর আমার ভালোবাসা-ভরা কৃতজ্ঞতা তোমাকে

জানাতে এসেছি। কিন্তু এ আমার কী দারুণ অদৃষ্ট। আমি আজ অপরের স্ত্রী, তোমার বন্ধুর স্ত্রী।

যূথিকা মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিমল অনুভব করিতে লাগিল, যূথিকার চাঁপার কলির মত অঙুলগুলির ফাঁক দিয়া চোখের জলের ঝরণা ছুটিতেছে, তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বুকভাঙা বেদনায় হাহাকার করিতেছে! বিনা ভাষায় এই প্রণয়-পরিচয় পাইয়া বিমলের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল—পিতামাতা ঘরসংসার ছাড়িয়া জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করিয়া পাগলের মত দেশে দেশে ঘুরিয়া মরিতেছিল যাহার উদ্দেশে, সেই তাহার প্রার্থিতা প্রণয়িনী আজ সে অপরের স্ত্রী হইয়াছে ; তাহার জন্য তাহাকে কোনো রকম তিরস্কারের কথা বিমলের মনে আসিল না। অজ্ঞাত রহস্যময় অ-বশ্যকে সে মনে মনে প্রণাম করিল ; কিন্তু তখনো সেই যদ্‌ভবিষ্যকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে না পারিয়া যূথিকাকে বাহুবেষ্টনে নিজের কাছে ধরিয়া রাখিয়া সে বিষণ্ণ উদাস স্বরে বলিল—যা হয়ে গেছে তাকেই চরম, তাকেই কল্যাণ ব'লে মেনে নিতে হবে—এ না হলে আমরা যে অসীম সুখে ডুবে যেতাম। তুমি পরের—তবু স্মৃতিতে কল্পনায় তুমি আমার! আমরা মনে করব—আমি যেন সেই যমুনা-পুলের ধারে তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় অনন্তকাল অপেক্ষা ক'রে আছি, আবার তোমায় পাব। এই আশাতেই আমাদের আজকের এই মিলন আজই এ জন্মের মতন শেষ ক'রে দিতে হবে।

অতীতের আনন্দ-স্মৃতি, বর্তমানের আনন্দ-সম্ভোগ আর ভবিষ্যতের বিরহ-বেদনা মিশ্রিত হইয়া যূথিকাকে অভিভূত করিয়া তুলিতেছিল। তাহার বিষাদ-আনত চোখের পাতার নীচে সকল

সত্য যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল ; অতি কোমল প্রণয়-মাখা মৃদু হাসি তাহার গালের ঠোঁটের চিবুকের টোল ভরিয়া টল্‌টল্ করিতেছিল। যূথিকা বিমলের পাশে লিপ্ত হইয়া আনন্দিত বিষাদের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে দেখে তুমি চিন্‌তে পারনি ?

বিমল স্নেহ ঢালিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি আমাকে চিন্‌তে পেরেছিলে ?

যূথিকা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার মূর্তি যে আমার হৃদয়ে কুঁদে কুঁদে গড়েছিলাম ; মনোমন্দিরে কৃতজ্ঞতার বেদীতে বসিয়ে সে মূর্তির নিত্য পূজা করেছি ভালবাসার অর্ঘ্য সাজিয়ে ! কতদিনে কত অশ্রু চক্ষু-শঙ্খে ভরে তোমাকেই পাদ্য দিয়েছি ! তোমার কথা যে আমার কানে দেবমন্দিরের আরতির ঘণ্টার মত বেজেছিল।

বিমল অতীতের স্মৃতির মধ্যে জন্মলাভের আনন্দে বলিয়া উঠিল—যূথি, আমার চোখ, কান, মন, হৃদয় এমন কি নির্বোধ ! এখানে এসে যেদিন তোমায় প্রথম দেখ্‌লাম, অমনি একটা আনন্দময় বিস্ময় আমার মনের মধ্যে বয়ে গেল ; সেই যে তোমার মায়ের ছবি অকস্মাতের সৌভাগ্যে আমার চোখে পড়েছিল, যার মধ্যে আমার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর আদল দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম, সেই ছবির, সেই ভিখারিণীর আদল তোমাতে দেখেও আমার মন তেমনি চমকে উঠেছিল। কিন্তু তুমি বিবাহিতা, ফণীর মত জমিদারের গৃহিণী, এই ঘটনাটাই আমার দিক্‌ভুল ক'রে দিয়েছিল। আমি তোমারই পাশে বসে অচেনা তোমারই কথা নিশিদিন ভাবতাম ! যূথি, তুমি আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর্‌লে না কেন ? তুমি ফণীকে কেন বিয়ে কর্‌লে ?

যূথিকা অতি কষ্টে অশ্রুসাগরের উদ্বেল জোয়ার ধৈর্যের বাঁধ দিয়া আপনাকে কথা বলিতে সমর্থ করিয়া বলিল,—যেদিন প্রথম তুমি আমায় বললে যে তুমি এগজামিন দিতে কলকাতায় চলে যাবে, সেইদিনই যেন কোন্ প্রতিকূল অদৃষ্টচক্র আমার সমস্ত সুখ আর আনন্দ নিঃশেষে চূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল। তুমি এগজামিন দিতে চলে গেলে আমার জীবনের সুখের সূর্য যেন রসাতল গেল—তোমার সঙ্গ আমার কাছে এমনি অমূল্য হয়ে উঠেছিল। সেই যমুনা-পুলের ধারে গভীর রাত্রে প্রথম যেদিন তোমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলাম, তুমি যখন বাংলা কথা কয়ে তোমার বন্ধুর কাছে পয়সা চাইলে আমাকে দেবার জন্মে, সেইক্ষণেই যে আমি তোমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ফেলেছিলাম! তারপর তোমার অসামান্য দয়া ত' আমাকে একেবারে কিনে নিয়ে দাসী করেছিল। আমি মনের মধ্যে তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজা করেছি। তোমার সুখের জন্মে আমার প্রাণ পর্যন্ত দেওয়া তখন আমার আনন্দের গর্বের গৌরবের ব্যাপার মনে হচ্ছিল। তোমার আচরণেও এই দীনা কুলশীলহীনা ভিখারিণীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেত, কিন্তু তোমার ব্যবহার কত সংযত, কত সম্ভ্রমপুত, কত ভদ্র ভব্য! তুমি চলে গেলে কেবলই মনে হতে লাগল তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। সেই কান্নায় কান্না জুড়ে দিয়ে আট দিন পরে মা হঠাৎ মারা গেলেন। তোমারই দেওয়া টাকায় তাঁর সৎকার শ্রাদ্ধ করতে পারলাম। শ্রাদ্ধের পর ত্রিবেণীর ঘাটে বসে কাঁদ্‌চি—এই বিশাল সংসারে কোথায় আশ্রয়, এই অকূলে কোথায় কূল! আমার চারিদিকে লোক জমে গেছে; সেই শোকের সময়ও বর্বর পুরুষেরা অকথ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়ে আমাকে ভীত ক'রে তুলেছে; এমন সময় একটি করুণাময়ী

রমণী এসে আমাকে স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'মা, তোমার কি হয়েছে?' তাঁকে দেখেই আমার মনে হ'ল উনি বড়ঘরের ঘরণী। তাঁর পায়ে পড়ে বললাম—'মা, আমার কেউ নেই, আপনি আমার মা, আমাকে অধর্মের আর ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচান!' তিনি দয়া ক'রে আমাকে মায়ের আদরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন, তিনি অমর ঠাকুরপোর মা, আপনার বন্ধুর পিসি। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার বাপ-মার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বিশ্বাস করলেন আমি ভদ্রঘরেরই মেয়ে। আমাকে তিনি আশ্রয় দিয়ে আশ্বাস দিলেন—দেশে ফিরে এসে আমার বিয়ে দেবেন। আমার মাথায় ভাবনার আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি তোমার দেখা পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। কিন্তু আমার দুরদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে ব'লে, তোমার প্রয়াগে আসবার দুদিন মাত্র আগে পিসিমা দেশে চলে এলেন; আমার প্রাণের রক্ত জল হয়ে চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল, পিসিমা মনে করলেন মায়ের মৃত্যুর স্থান ব'লে প্রয়াগ ছাড়তে আমার অত কষ্ট হচ্ছে। আমি লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারলাম না যে, প্রয়াগ ছাড়তে আমার সমস্ত সুখের মৃত্যু হচ্ছে। আমি নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রয়াগে পড়ে থাকতেও সাহস করলাম না। তুমি আমায় কখনো তোমার বাড়ীর ঠিকানা বলনি; আমিও কখনো জিজ্ঞাসা করিনি। সেই মিলনের তন্ময়তায় মনে করেছিলাম আমাদের কখনো বিচ্ছেদ হবে না, আমরা দুজনে একসঙ্গে চিরদিন থাকব—সেই আমাদের ঠিকানা। প্রয়াগ ছেড়ে আমার ভুল ভাঙ্‌ল। তখন সেই তোমার নির্দিষ্ট দিনের সন্ধ্যাবেলা আমি কল্পনায় দেখছিলাম, তুমি উৎফুল্ল হয়ে যমুনার পুলের কাছে জোরে হেঁটে এসে দাঁড়ালে, উৎসুক হয়ে আমার আসার পথের দিকে ঘন ঘন তাকাতে লাগলে, তোমার সমস্ত দেহ মন দৃষ্টিতে

ও শ্রবণে উন্মুখ হয়ে উঠল ; ক্রমে তুমি অধৈর্য হয়ে উঠলে ; শেষে হতাশ হয়ে চলে গেলে। আমার মনে হোত তারপর রোজ সন্ধ্যা-বেলা তুমি আমাকে তেমনি ক'রেই যমুনার ধারে ধারে খুঁজে বেড়িয়েছ। কিন্তু দিনের পর দিন হতাশ হয়ে বিরক্তিতে তুমি আমার সন্ধান ছেড়ে দিয়েছ, কালে কালে আমার স্মৃতি তোমার মনে ক্ষীণ হয়ে আসছে, আমার কথা দুঃস্বপ্নের মত হয়ত এক একবার মাত্র মনে হচ্ছে—এ ভাবতে আমার বুক ফেটে যেত। তার ওপর যখন অমর-ঠাকুরপো লোলুপ হয়ে আমার কানে লালসার মন্ত্র গুঞ্জন করতে আরম্ভ করলে, যখন ছেলেকে ডাইনীর মায়ায় পড়ে অধঃপাতে যেতে দেখে পিসিমা শঙ্কিত হয়ে উঠে আমাকে দূর করবার জন্যে ব্যস্ত ও উগ্র হয়ে উঠলেন। যখন আমাকে বুড়ো গোমস্তা গুরু-দয়ালের হাতে ফেলে দিয়ে পিসিমা নিশ্চিন্ত হবার সঙ্কল্প করলেন, আর অমর-ঠাকুরপো আমায় চুপি চুপি আশ্বাস দিয়ে গেল যে গুরু-দয়াল শুধু নামে বিয়ে করবে, আমি গুরুদয়ালের বাড়ীতে অমরেরই থাকব, তখন আমার দুঃখ চরমে পৌঁছল। তখন আমার মরণ ছাড়া মুক্তির পথ রইল না ; কিন্তু তোমাকে আর একবার দেখবার প্রলোভন আমাকে মরতে দিচ্ছিল না। এমন সময় তোমার বন্ধু পিসির বাড়ী তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে গেলেন ; আমাকে তাঁর মনে ধরল ; তিনি বিয়ের বাঁধনে ধরা না দিয়েই আমাকে গৃহিনী করবার ইঙ্গিত জানালেন ; আমি যখন ঘৃণা ক'রে সে কথা কানেই তুললাম না, তখন তিনি আমাকেই বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠলেন। আমার ত' সমস্ত সুখের মরণ হয়েছেই, ধর্ম বাঁচবে ব'লে আমি তোমার বন্ধুর প্রস্তাবে সম্মত হলাম—তোমার প্রণয়িনী আমি, হলাম তোমার বন্ধুর স্ত্রী।

বিমল যূথিকার কথা শুনিয়া শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—হায় অভাগী! এমন সরস কোমল প্রাণ, এমন অফুরন্ত স্নেহ, এত বিদ্যা শিক্ষা ভব্যতা নিয়ে তুমি কিনা হলে ফণী নাগের নাগিনী! আমার মন বিদ্রোহী হলেও তুমি তারই হয়েছ। আর আমার এখানে থাকা একদণ্ডও উচিত হবে না। সে যতই বর্বর হোক না, তাকে একদিন বন্ধু ব'লে মেনেছি, তার আতিথ্য গ্রহণ ক'রে আছি। আমা হতে তার মর্যাদাহানি ঘটবার অবসর আমি রাখব না—আমাদের বিচ্ছেদ অনিবার্য যখন, তখন আজকেই আমি যাব। বিমল গভীর স্নেহে যূথিকার মস্তক চুম্বন করিল।

যূথিকা অস্ফুটস্বরে বলিল—এতকাল পরে আজ আমাদের দেখা হয়েছে, আজকের দিনটি তুমি থাক। তুমি চলে গেলে আমার সুখের ঘরে চিরদিনের জন্যে তালা পড়বে; যে কঠোর কর্কশ ব্যবহার আমাকে নিত্য সহ্য করতে হয় তখন তা কঠিনতর মনে হবে! সেই দুঃসহ দুর্দিনে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার মত একটি দিন তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ো না।

বিমল একটু চিন্তা করিয়া বলিল—দেখ যূথি, আমি ফণীকে সব কথা খুলে বলি। সে তোমাকে ভালোবাসে না, সে তোমার ওপর সন্তুষ্ট নয়; সে তোমাকে ত্যাগ করুক, আমার জিনিস আমায় ফিরিয়ে দিক্। আমি ফণীর মত বড়লোক নই; আমার কুঁড়েঘরে এমন আরামের প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার ঘরে তোমাকে আমার প্রেমে অভিষেক ক'রে আনন্দের মুকুট পরিয়ে দেবো, তুমি আমার হৃদয়রাণী হয়ে থাক্‌বে। আর আমি হব তোমার আদেশের দাস।

যূথিকা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—তা হওয়া যদি সম্ভব হ'ত! তোমার বাড়ীতে গিয়ে তোমার

দাসী হয়ে তোমার সেবার অধিকার যদি পেতাম, তোমার চোখের ইসারায় আমার প্রাণ দিয়ে তোমার দয়ার ভালোবাসার অপার ঋণের এক কণাও যদি শুধতে পারতাম! কিন্তু আমি যে বন্দিনী! আমি যে আর-একজনকে স্বেচ্ছায় স্বামী ব'লে স্বীকার করেছি!

বিমল দুঃখভরা গভীর স্বরে বলিল—তবে এই শেষ হোক্, আজই আমাদের এ জন্মের মত শেষ দেখা।

যূথিকা বিমলের বুকে মুখ রাখিয়া ক্রন্দন-জড়িত অস্ফুটস্বরে বলিল—এ জন্মের মত তবে এই শেষ!

যূথিকার মুখের কথা মিলাইতে উহাদের পশ্চাৎ হইতে গর্জন শোনা গেল—তবে রে নচ্ছার, তুই এখানে কী করছিস্!

যূথিকা ও বিমল ভয় পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—অগ্নিমূর্তি হইয়া ফণী রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, দাঁতে-দাঁত ঘসিয়া গর্জন করিতেছে, তাহার এক হাতে একখানা কাগজ, অপর হাতে ঘোড়ার চাবুক মারিতে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। সেই দুরন্ত চাবুক নিষ্ঠুর বেগে যূথিকার শুভ্র কাঁধের উপর আস্ফালন করিয়া আর-একটু হইলেই পড়িত—বিমল এক লাফে আগাইয়া গিয়া ফণীর হাত মোচড়াইয়া চাবুক কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর শান্ত মিনতির স্বরে বলিল—ফণী তোমায় মিনতি করি, এখানে এখন কেলেঙ্কারী কিছু কোরো না। তোমার চাকর-বাকর জন-মজুর চারিদিকে, তোমার নিজের স্ত্রীর, নিজের বাড়ীর মর্যাদা নষ্ট কোরো না।

ফণী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—রেখে দাও হে সাধু-পুরুষ তোমার লেক্‌চার! ভিজে বেরালটি হয়ে বন্ধু সেজে বাড়ীতে ঢুকে সমস্ত মর্যাদার মাথা খেয়ে এখন আর উপদেশ দিতে হবে না! আমি

আগেই জানি, যেদিন ঐ ঘুঁটে কুড়ুনি নচ্ছার ভিখারীকে আমার বাড়ীতে ঠাঁই দিয়েছি, সেইদিনই আমার মান-মর্যাদা সব চুলোয় গেছে। আজকে একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে।

বিমল ও যূথিকার দিকে হাতের কাগজখানা বাড়াইয়া ধরিয়া ফণী বলিতে লাগিল—শকুন্তলার পত্রলিখন! দুষ্মন্ত যখন পরিত্যাগ করলে তখন সোনাতলার রাজার ঘরই সই! আর তুমি বদমায়েস। যেই খবর পেয়েছ যে, তোমার উচ্ছিষ্ট আমার পাতে পড়েছে অমনি রঙ্গ দেখতে এসে জুটেছ! এখনি ডাকছি আমার দারোয়ানকে, তোমাদের দুজনকে জুতোতে জুতোতে খেদিয়ে বার করবে—তোমার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী যমুনার পুলের ধারে দাঁড়িয়ে আবার ভিক্ষা করবেন, আর পাজির পা-ঝাড়া তুমি আমাকে এই রকম ঠকিয়ে অপমান অপদস্থ করার জাবাবদিহি ক'রে তবে নিষ্কৃতি পাবে! বে-ইমান বদমায়েস কাঁহাকা!

রাগে জ্ঞানশূন্য হইয়া ফণী যে কি বলিবে ও কি করিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এরূপ অবস্থায় প্রতিপক্ষের লোক যদি নিজেকে শান্ত সংযত রাখিতে পারে, তবে তাহার সঙ্গে সেই অবশচিত্ত লোক আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বিমল স্তম্ভিত হইয়া গেলেও ফণীর ন্যায় অস্থির জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে নাই; বিমল একবার যেই যূথিকার দিকে তাকাইয়া দেখিল যে সে মৃত্যুবিবর্ণ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া অপমানে ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, অমনি তাহার তখন কি করা দরকার স্থির হইয়া গেল। বিমল ফণীর আস্ফালন কটুকাটব্য গ্রাহ্য মাত্র না করিয়া যূথিকার হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেল। ফণী সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উহাদের নিঃসঙ্কোচ অগ্রাহ্য দেখিয়া দাঁতে দাঁত রাখিয়া রাগে গিস্‌গিস্

করিতে লাগিল। সে তাহার চাকরদের ডাকিয়া ঐ দুটা বদমায়েসকে জুতা মরিয়া, বাড়ী হইতে তখনই বাহির করিয়া দিবার হুকুম দিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহাতে আপনারই অপমান ভাবিয়া কোনো মতে নিরস্ত হইয়া রহিল।

বিমল ও যূথিকাকে তাহারই বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া ফণীও ছুটিয়া বাড়ীতে গেল। ফণী এ-ঘর ও-ঘর ছুটাছুটি করিয়া তাহাদিগকে খুঁজিতে খুঁজিতে বৈঠকখানার-ঘরে গিয়া দেখিল যূথিকা একখানা সোফার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, আর তাহার পাশে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ নিঃশব্দ বিমল নদীর ওপারের বিস্তীর্ণ মাঠের সবুজ শস্যক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া আছে। ফণী ঘরে ঢুকিয়াই ঘরময় দাপাদাপি করিয়া তর্জন আস্ফালন গালা-গালি সুরু করিয়া দিল; শেষে ক্লান্ত হইয়া ঘরের অপর প্রান্তে এক কোণে সোফার উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—উঃ! এত বড় কালনাগিনীকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম! ওকে ত্যাগ ক'রে ওর বিষদাঁত আমি ভাঙব!

বিমল আস্তে আস্তে ফিরিয়া ধীর শান্ত স্বরে বলিল—এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা বললে। ফণী নাগের স্ত্রী যে নাগিনী এটা ভাই তোমার মস্ত আবিষ্কার।

ফণী রাগে ক্ষিপ্ত হইয়া সোফার উপরে এমন জোরে এক ঘুষি মারিল যে সোফার কাপড় ছিঁড়িয়া নারকোল-ছোবড়া বাহির হইয়া পড়িল; তথাপি নিরস্ত না হইয়া ফণী ঘুষির উপর ঘুষি মারিয়া ধূলা উড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চোপরাও শূয়ার। তোমার ঠাট্টাবাজি বার ক'রে দেবো। এই ফণী নাগের কামড়ের বিষে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে মারব। তোমার নামটি বিমল, কিন্তু চরিত্তিরটি একেবারে

পেঁকো, পচা! আদালতে ডিভোর্সের মকদ্দমা এনে তোমাদের দুজনকে সমাজের কাছে অপদস্থ ক'রে তবে ছাড়ব!

বিমল তেমনি শান্তভাবে বলিল—এতেও তোমার সুবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে,—ভাগ্যিস্ ভাই, তখন বুদ্ধি ক'রে রেজেষ্টারী বিয়ে করেছিলে; তাই ত বাঁচোয়া! নইলে তুমি অনায়াসেই যূথিকে ত্যাগ ক'রে আবার একটা বিয়ে কর্‌তে। এখন যদি তুমি যূথিকাকে ত্যাগ কর তবে আদালত ওকেও মুক্তি দেবে!

ফণী আপনার পরাজয় ও বিমলের শান্ত নিশ্চিন্ত বে-পরোয়া ভাব দেখিয়া আর সাম্‌লাইতে পারিল না; চাবুক তুলিয়া তাড়া করিয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—বেরো তোরা, বেরো আমার বাড়ী থেকে! তোদের তাড়াতে আমায় আবার আদালতে যেতে হবে? আমি তোদের চাব্‌কে বার কর্‌ব! বেরো বেরো, এখনি, এই এই দণ্ডে!

যূথিকা স্বামীর আক্রমণ হইতে বিমলকে বাঁচাইবার জন্য চোখের পলকে সোফা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া স্বামীর দুই পা জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সে অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে মিনতি-বিগলিত করুণ স্বরে স্বামীকে বুঝাইতে চাহিল সমস্ত অপরাধ তাহার, সমস্ত শাস্তি তাহার প্রাপ্য—বিমল একেবারে নির্দোষ! ফণী বিমলের ঘরে যূথিকার লেখা যে চিঠি কুড়াইয়া পাইয়াছে, তাহাতেই ত' প্রমাণ হইতেছে বিমল জানিত না যে, যূথিকাই তাহার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী! বিমল আজ জানিয়াছে মাত্র, এবং তাহার জন্য যূথিকাই দোষী!

ক্রুদ্ধ ফণী পদতলে পতিতা স্ত্রীর পিঠে চাবুক ভাঙিতে উদ্যত হইতেছিল। বিমল তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাত হইতে চাবুক

কাড়িয়া লইয়া যূথিকাকে ধরিয়া তুলিল ; বাম বাহুর বেষ্টনে যূথিকাকে আগলাইয়া ধরিয়া বিমল শান্তভাবে বলিল—দেখ ভাই ফণী, তুমি চিরকালই আমাকে উপদেশ দিয়ে এসেছ, কিন্তু আমি কখনোই সে-সব শোনার উপযুক্ত মনে করিনি ; কিন্তু আজ তোমার উপদেশ মান্‌ব। আমি তোমার বাড়ীতে চিরদিনের জন্য থাক্‌তে আসিনি ; এতদিন চলেই যেতাম ; তুমিই অমৃতবাবুর টাকাগুলি আদায় করিয়ে দেওয়াবার জন্যে আমাকে আটকে ধরে রেখেছিলে। বন্ধুর কাজই করেছ—যাকে খুঁজে খুঁজে পথে পথে বেড়াচ্ছিলাম, তাকে পেয়েছি। কিন্তু সে এখন তোমার স্ত্রী ; তাই তাকে তোমারই রেখে আমার দুঃখের বোঝা নিয়ে আমি কালই চলে যেতাম। কিন্তু তুমি যে রকম পাষণ্ড, তাতে আমি আর যূথিকে তোমার কাছে অসহায় রেখে চলে যেতে পারব না, তা হোক না কেন সে তোমার স্ত্রী !

ফণী রাগের তাচ্ছিল্যে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তোমার কথা শুনে ভ্রম হয় যেন ও তোমারই সম্পত্তি, আমিই চোর দায়ে ধরা পড়েছি ! ও হো হো, ভুলে গিয়েছিলাম, ও যে একদিন তোমারই উপভোগ্য ছিল ! এখন তবে শুনি, ওকে নিয়ে কোথায় রাখা হবে ? সোনাগাছিতে না হাড়কাটার গলিতে ?

বিমল ফণীর কদর্য কথায় কান না দিয়া যূথিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—অমরের মায়ের কাছে তুমি নিরাপদ আশ্রয় পাবে মনে কর কি ?

যূথিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—হাঁ, আমাকে পিসিমার বাড়ীতেই নিয়ে চল।

বিমল একটু চিন্তা করিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া উচিত হবে না ; তুমি এখানকার যাকে বিশ্বাস কর তাদের সঙ্গে নিয়ে

যাও। সেখানে গিয়ে অপেক্ষা ক'রে দেখ, এই বনমানুষটা রত্নের আদর বুঝতে পারে কিংবা অমূল্য রত্নকে ত্যাগ করতেই গোঁ ধরে থাকে।

যূথিকা একজন দাসী ও বুড়া জমাদারকে সঙ্গে করিয়া অমরনাথের মায়ের কাছে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিমল বলিয়া দিল, যূথিকা সেখানে কয়েক দিনের জন্য বেড়াইতে গিয়েছে শুধু ইহাই যেন বলে ; ফণীর আচরণ শীঘ্র প্রকাশ না করাই ভালো ; বিমল আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে ফণীকে শান্ত করিতে পারে কিনা।

বিমলের কথা শুনিয়া যূথিকা জোর দিয়া ঝাঁঝের সহিত বলিয়া উঠিল—না না, আমার এই অগস্ত্য-যাত্রা, এ বাড়ী মাড়াতে আমি আর আস্‌ছি না। তোমরা পুরুষ-মানুষ, মনে কর মেয়ে-মানুষের অসীম ধৈর্য ! কিন্তু আমরা মেয়ে হলেও মানুষ ত'? মানুষের ধৈর্যের সীমা আছে ! আমি ঢের লাঞ্ছনা, ঢের অপমান সয়েছি ; কিন্তু আজ তার চরম হয়ে গেছে ; আমি ওকে জীবনে ক্ষমা করতে পারব না। কোথাও ঠাঁই না পাই, আবার যমুনা-পুলের ধারে হাত পেতে দাঁড়াব, একটা পয়সার জন্যে পথিকদের কাছে মিনতি করব, তবু রাণী হয়ে থাকবার জন্যে এর অপমান আর সইব না।

বিমল ব্যথিত ও কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আর কিছুই বলিতে পারিল না। নীরবে যূথিকাকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া বিদায় দিল।

যূথিকা চলিয়া গেলে বিমল ফণীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সে অমৃতবাবুকে যূথিকাদের নূতন ঠিকানা জানাইয়া শীঘ্র আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার অনুরোধ করিয়া একখানা দীর্ঘ জরুরী টেলিগ্রাম করিল, এবং তাহার পরে আপনার পথিক-জীবনের সামান্য উপকরণগুলি বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

এমন সময় ফণী তাহার ঘরে আসিল ; যুথিকা যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর স্বাক্ষরে বিমলকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, সেই চিঠিখানি তাহার হাতে। বিমল বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আর একটা রাগ প্রকাশের পালা আশঙ্কা করিল। কিন্তু ফণী গরম অথচ শান্ত ভাষায় বলিতে লাগিল—

—দেখ বিমল, এই অলক্ষুণে চিঠিখানা যতবার পড়ছি, ততই আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে তুমি নির্দোষ, এই চিঠি লেখার আগে তুমি ওকে চিনতে পারনি। তোমাদের আজকের কাণ্ড যা দেখেছিলাম তাতে তোমার বেশী অপরাধ নেই বুঝতে পারছি।—সে যখন পরপুরুষকে এই সাংঘাতিক চিঠি লিখেছে, তখনই তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘুচে গেছে। তোমার আমার এতকালের যে সম্পর্ক তারই খাতিরে তুমিও আমাকে এমনি সদয়ভাবে বিচার করবে আশা করি ; আর তা' হলেই আমরা দু'জনে ঠাণ্ডা হয়ে যূথিকার বিষয় আলোচনা ক'রে তার একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে পারব।

ফণীকে শান্ত দেখিয়া বিমল উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—দেখ ভাই ফণী, ভগবান সাক্ষী, সত্যের নামে শপথ ক'রে বলছি, তার আর আমার মধ্যে আগে বা সম্প্রতি এমন কিছু হয়নি যাতে ক'রে সে তোমার স্ত্রী হবার অনুপযুক্ত হতে পারে ; সে নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক ! সে গরীব অবস্থায় বিপদে পড়ে সাহায্য খুঁজতে বেরিয়েছিল—

ফণী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—ভিখিরী ছুঁড়ি রূপের ফাঁদ পেতে পুরুষ ধরতে বেরিয়েছিল বল না কেন, অত ঢেকেঢুকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলবার দরকার কি ! শহরের অলিগলি ফিরে পয়সা রোজগার করাই ছিল ওর পেশা ! আমি ত' সেদিন তোমার সঙ্গেই ছিলাম, আমায় তুমি অমনি বোকা বুঝিয়ে দেবে, আর আমি তাই মেনে যাব ?

তখন এগজামিনের চাপ না থাকলে আমিই কি চুপ ক'রে থাক্‌তাম নাকি? তোমার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীর সঙ্গে আমিও ভিড়ে যেতাম, আর তা' হলে এই কেলেঙ্কারী কাণ্ডটা ঘটতে পেত না।

বিমল বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ফণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—যাক্‌, তুমি যা বল্‌ছ তা' আমি অবিশ্বাস করছিনে; কিন্তু আমার অপমানের ত' চূড়ান্ত হয়েছে—সোনাতলার নাগবংশে ও হ'তে একটা কেলেঙ্কারী হ'ল! রাজা ফণীন্দ্রনাথ নাগের পাটরাণী যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী!—তাই অপমান আর কেলেঙ্কারীর পক্ষে যথেষ্ট!

বিমল বলিল—ওর বাপও ত' জমিদার ছিলেন, মা সৎ-বংশের মেয়ে·

ফণী বিমলের কথায় বাধা দিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—মিথ্যা! বানানো! ওর কথা বিশ্বাস ক'রেই ত' ঠকেছি। সোনাগাছি থেকে একটা ছুঁড়ি এসে যদি বল্‌ত আমি সাবিত্রীর অতিবৃদ্ধ-প্রদৌহিত্রী তবে আমি হয়ত তাকে বিশ্বাস ক'রে বিয়ে কর্‌তাম! উঃ! কী বোকামিই করেছি।

বিমল তাহার কথায় বিরক্ত হইয়াও আপনাকে দমন করিয়া শান্ত স্বরেই বলিল—আমার কাছে ওসব বংশ-কুল-গোত্রের কোনো মর্যাদা নেই, আমি মানি আমাদের দেশেরই শাস্ত্রের বচন—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি! প্রধান গলদ হয়েছে গোড়া থেকেই, যে, তুমি যাকে বিয়ে করেছিলে তাকে পত্নীর সম্মান দাওনি, তুমি নিজে পতি বা স্বামী হয়ে স্ত্রীকে দাসী ক'রে রেখেছিলে, এ অবস্থায় সে তোমাকে কখনো ভালোবাস্‌তে পারেনি। তুমি অমন স্ত্রীর স্বামী হবার উপযুক্ত নও, সেও তোমার উপযুক্ত নয়।

ফণী জোরে বিমলের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল—তুমি এতক্ষণে একটা খাঁটি কথা বলেছ! আমরা কেউ কারো উপযুক্ত নই—ঠিক কথা! রাজা ফণীন্দ্রনাথ নাগের উপযুক্ত যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী নয় নিশ্চয়ই। আমি তার সঙ্গে ইস্তকনাগাদ যে ব্যবহার করেছি তা ঠিকই করেছি—ভিখিরী ওর চেয়ে বেশী কি প্রত্যাশা করে! ওর চারিদিকের বাতাসে যেন একটা জঘন্য নীচতা ঘুলিয়ে বেড়াত, সত্যি বল্‌ছি।

ফণীর এই কদর্য ভাষায় বিমল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারও ঠোঁটের আগায় একটা কড়া রকমের পাল্টা জবাব খসি-খসি করিতেছিল; কিন্তু যূথিকার সহিত ফণীর মিলনের পথ ক্রমশ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সে আপনার বাক্যের খোঁচা সরাইয়া রাখিল। বিমল ধীর-শান্তভাবে ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া যূথিকা সম্বন্ধে ফণীর কি কর্তব্য তাহারই আলোচনা আরম্ভ করিল। বিমল অনেক করিয়া ফণীকে বুঝাইল যে, যূথিকার মত মেয়ে রূপে, গুণে, ভব্যতায় বাংলাদেশে দুর্লভ ও অতুল্য; তাহাকে ভালোবাসা দিলেই সে কৃতার্থ হইয়া আপনিই যে দাসী হইবে। কিন্তু ফণী বুঝিবার পাত্র নয়, সে বলে ঐ নষ্ট স্ত্রীলোককে লইয়া ঘর করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, তাহাকে ভালোবাসার ত' কথাই নাই। তখন উভয়েই একমত হইয়া স্থির করিল যে আদালতে গিয়া বিবাহবন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।

এই দুর্ঘটনার কিছুদিন পরে বিমল একাকী চিন্তাকুল গম্ভীর মুখে পাবনা শহরে ইছামতী নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল ; যূথিকা আসিয়া এইখানে ফণীর পিসিমার কাছে আছে, তাই বিমলও তাহার কাছাকাছি থাকিবার জন্য এখানে আসিয়াছে। কিন্তু ফণীকে স্ত্রী-গ্রহণে সম্মত করাইতে না পারিয়া এবং যূথিকা স্বামীর গৃহে ফিরিতে অস্বীকার করাতে বিমল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অথচ উহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের দুঃখের অন্তরালে যূথিকাকে পাওয়ার সম্ভাবনার একটি ক্ষীণ আনন্দ যে বিমলের মনে থাকিয়া থাকিয়া উঁকি মারিতেছিল না এমনও নহে। কিন্তু পাবনায় আসিয়া অবধি বিমলের কেমন মনে হইতেছে, এই জায়গার নামটা বড় অপয়া, এ যেন তাহার মনকে দমাইয়া দিয়া বলিতেছে—পাব না, পাব না, পাব না !

বিমল এই সব কথা ভাবিতেছে এমন সময় একখানা নৌকা ঘাটের দিকে আসিতেছে দেখা গেল। বিমল থমকিয়া দাঁড়াইয়া নৌকার দিকে দেখিতে লাগিল। নৌকা নিকটে আসিতেই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছই-এর ভিতর হইতে বাহির হইয়া গলুই-এর উপর দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বিমল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে অমৃতবাবু।

নৌকা কূলে না ভিড়িতেই অমৃতবাবু লাফাইয়া ডাঙায় নামিয়া বিমলকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগরুদ্ধ স্বরে বলিয়া

উঠিলেন—কই, কোথায় আমার লীলার মেয়ে? বল বল বিমলবাবু, সে কি নিকটেই আছে?

বিমল তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—এই শহরেই আছে; চলুন আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বিমলকে বাহুবেষ্টনে আপনার পাশে টানিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—বাবা, তুমি যে আমার কী উপকার করেছ! তোমার টেলিগ্রাম পেয়েই আমি ছুটে বেরিয়ে পড়েছি, আমার লীলার মেয়ের সন্ধান পেয়ে আর কি আমি চুপ করে থাক্‌তে পারি? সে রাজরাণী হয়েছে! তার সুখের সংসার একবার আমি চোখে দেখে মরতে চাই! সে কি তার মায়ের মতন দেখতে হয়েছে? সে তার মায়ের কথা কিছু কি বলে?

বিমল তাঁহার অবিশ্রাম প্রশ্নের উত্তরে অসম্পূর্ণ উত্তর দিয়া দিয়া শান্ত করিয়া তাঁহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেল। বৃদ্ধ সেই ক্ষুদ্র বাসা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাড়ীতে আমার লীলার মেয়ে থাকে? তুমি না বলছিলে সে রাজরাণী হয়েছে?

বিমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—এ বাসা আমার! আপনি একটু বসে বিশ্রাম করুন; তারপর আমি নিয়ে যাব···

অমৃতবাবু অধৈর্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—না না, আমার বিশ্রামের দরকার নেই, আমাকে এখনই আগে তার কাছে নিয়ে চল, আমার লীলার মেয়েকে আগে দেখি।

বিমল বৃদ্ধের স্নেহব্যাকুল আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বলিল—আগে তার মায়ের আর তার সমস্ত ইতিহাসটা শুনে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে ভাল হয় না?

লীলার কন্যাকে দেখিবার অধৈর্য ও তাহাদের মাতা-পুত্রীর কাহিনী শুনিবার কৌতূহলে ইতস্তত দোল খাইতে খাইতে বৃদ্ধ বিমলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে গেলেন ; এবং প্রথম আসন যাহা দেখিতে পাইলেন তাহারই উপর বসিয়া পড়িয়া অধৈর্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন—বল বল, সংক্ষেপে চটপট তোমার কথা শেষ ক'রে নাও, পরে আবার বিস্তারিত শুনব। খুব সংক্ষেপে·········বুঝলে বিমলবাবু, খুব সংক্ষেপে······

বিমল বলিতে আরম্ভ করিল—যূথিকার জন্মের সম্ভাবনা দেখিয়া যূথিকার পিতা কী হৃদয়হীন নিষ্ঠুরভাবে যূথিকার মাকে ত্যাগ করিয়াছিল। তেজস্বিনী লীলা স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া তাহার এক পয়সা না লইয়া কেমনভাবে নানান্ শিল্পকাজ করিয়া আপনার ও কন্যার ভরণপোষণ করিয়াছিলেন।

শুনিতে শুনিতে অমৃতবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—কী বলব, সে পাষণ্ড ললিতটা আপনা হতেই নরকে গেছে। নইলে আমি পিস্তলের গুলিতে তার মাথার খুলি উড়িয়ে তার নরকে যাবার পথ খোলসা ক'রে দিতাম ! পরক্ষণেই আপনার ভুল বুঝিয়া মমতার নম্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন—না না, আমি অমন কাজ করতাম না, সে যে আমার লীলার স্বামী, লীলা যে তাকে ভালোবাসত !······ বিমলবাবু, তুমি বড় তাড়াতাড়ি করছ বাবা ! লীলার মেয়ের কাছে লীলার কথা যা যা শুনেছ সব আমায় খুঁটিয়ে বল, শুনি।

বৃদ্ধ অমৃতবাবুর কথায় মনে মনে হাসিয়া বিমল বলিতে লাগিল—চিন্তা ও উদ্বেগে এবং অধিক শ্রমের ফলে লীলা পীড়িত হইয়া পড়াতে তাহারা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়ে এবং আর কোনো উপায় না দেখিয়া যূথিকাকে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে হইয়াছিল।

অমৃতবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়া উঠলেন—হায় হায়! আমি এত টাকা জমিয়ে বসে ছিলাম, আর লীলাকে ওষুধ-পথ্যির জন্যে মেয়েকে ভিক্ষা করতে পাঠান হয়েছিল! তারপর, তারপর বিমলবাবু?

বিমল বলিতে লাগিল—ভাগ্যক্রমে সেই প্রথম দিনই ভিক্ষায় বাহির হইয়া বিমলের সঙ্গে যুথিকার দেখা হয়, তারপর তাহাকে মায়ের চিকিৎসার খরচের জন্য আর কাহারো কাছে হাত পাতিতে হয় নাই।

অমৃতবাবু উচ্ছ্বসিত হইয়া অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে বিমলকে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন—বাবা, তুমি আমার লীলার মৃত্যু-কালকে নিতান্ত নিরুপদ্রব করেছিলে; লীলার মেয়েকে ভালোবেসেছিলে; তাইতেই তোমায় রেলগাড়ীতে প্রথম যেদিন দেখি, সেইদিনই তোমায় পরমাত্মীয় ব'লে মনে হয়েছিল। তোমায় আমার জামাই-রূপে দেখতে পেলে আরো কত সুখ হ'ত! তুমি আমার যুথিকা মাকে বিয়ে করলে না কেন বাবা?

বিমল লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া অমৃতবাবুকে তাহার এগজামিন দিতে যাওয়া, যুথিকার মায়ের মৃত্যু, যুথিকার আশ্রয়লাভ এবং পরিশেষে ফণীর সহিত বিবাহের কাহিনী বলিল।

অমৃতবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—মা আমার রাজরাণী হয়েছে, বেশ হয়েছে! জীবনটা বড় কষ্টেই আরম্ভ হয়েছিল, অভাবের কষ্ট ত' ঘুচেছে! কিন্তু বাবা, তোমায় না পাওয়ার দুঃখ তার স্বামীর ভালোবাসায় সে ভুলতে পেরেছে ত'?

বিমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া যুথিকার উপর ফণীর শাসন ও অত্যাচার এবং সর্বশেষে তাহাকে অভদ্র অপমানের কথা বলিতেই বৃদ্ধ অমৃতবাবু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—এত বড় আস্পর্ধা সেই বন-

গাঁয়ের শেয়াল রাজার, যে আমার লীলাকে অকথা বলে, লীলার মেয়েকে কুকথা ব'লে অপমান করে! জানে না সে, আমি মগের মুল্লুকে থাকি!—আমার এই স্বল্প-অবশেষ জীবনের মমতা আমার নেই!

ক্রোধে কম্পমান ও উত্তেজনায় ক্লান্ত বৃদ্ধকে বিমল সযত্নে ধরিয়া বসাইয়া সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল যে, ফণীকে শাস্তি দিবার আর দরকার হইবে না; যূথিকা তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে; ফণীও বিবাহভঙ্গের আবেদন আদালতে করিয়াছে; এখন বাকী শুধু অমৃতবাবু যূথিকাকে তাঁহার আশ্রয়ে লইয়া যাইবেন। এই বলিয়া বিমল লীলার ছবিখানি বুক পকেট হইতে বাহির করিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে ধরিল।

বৃদ্ধ সেই প্রণয়-প্রতিমার ছবি দেখিয়া রাগ দ্বেষ সব ভুলিয়া সুখাবেশে আপ্লুত হইয়া গেলেন; হর্ষ-গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—এই, এই ত' আমার লীলা আজও তেমনি আছে!—যূথিকা ঠিক মায়ের মতন হয়েছে কি? চল বাবা, চল, আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল! আমি তোমাকে ছেলে পেয়েছি; আমার মেয়েটিকে দেখাও!

বিমল বৃদ্ধকে লইয়া অমরদের বাড়ীতে গেল। যূথিকা লজ্জা-জড়িত গতিতে নত স্মিত মুখে আসিয়া এই অপরিচিত বৃদ্ধ আত্মীয়কে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মাথায় অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বারবার তাহার মস্তক চুম্বন করিলেন। তারপর লীলার ছবিখানি বাহির করিয়া তাহার সঙ্গে যূথিকার মুখের আদল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে কেবলই বলিতে লাগিলেন—এ যে ঠিক লীলারই ছবি! এ যে অবিকল লীলা বসানো!

বৃদ্ধের আবেগভরা বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া যূথিকার চোখেও আনন্দাশ্রু বহিতেছিল। ঘরে উপস্থিত বিমল ও অমর এবং অন্তরাল হইতে যে-সব মহিলারা খড়খড়ি তুলিয়া বৃদ্ধের সহিত যূথিকার মিলন দেখিতেছিলেন, তাঁহাদেরও চক্ষু শুষ্ক রহিল না।

অমৃতবাবু একটু সংযত হইয়া যূথিকার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—চল না তুমি আমার সঙ্গে ; তোমার কেউ নেই, আমারও কেউ নেই ; তুমি আমার মা, তুমি আমার মেয়ে ; আমি তোমার ছেলে ; এই বুড়ো তোমার কোলে মাথা রেখে সুখে মরবে। সম্বন্ধের, হৃদয়ের, আর এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের দুঃখের বন্ধনে আমি তোমার যত আপনার এত আপনার তোমার এজগতে আর কেউ নেই।

যূথিকা এই কথার উত্তরে চুরি করিয়া একবার বিমলের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধের শেষ কথায় প্রতিবাদ করিল। তারপর লজ্জিত স্মিত মুখে বৃদ্ধের চরণধূলি লইয়া আবার প্রণাম করিল।

এই মিলনের আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। চারদিন পরেই অমৃতবাবু বর্মায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সেখানে তাঁর বিষয়-কর্মের ব্যবস্থা এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। যূথিকাও তাঁহার সহিত যাইবে, তাঁহার অতুল ধনসম্পত্তি সমস্তই ত' তাহার, সে বুঝিয়া দেখিয়া লইবে। বিমল একবার ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া একটু ইঙ্গিতে আভাসে বৃদ্ধকে জানাইয়াছিল যে, আদালত হইতে যূথিকার বিবাহভঙ্গ হইয়া গেলে এবং অমৃতবাবুর মত পাইলে সে যূথিকাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মর্মাহত হইয়াছিলেন। এও কি একটা কথা! যদিও সেই নিষ্ঠুর স্বামীর কাছে যূথিকা আর কখনো যাইবে না, তবু ত' সে স্বামী। স্বামী জীবিত থাকিতে আবার বিবাহ! যদিই ধরা যায় আইনের চক্ষে সে স্বামী মৃত, তবে ত' যূথিকা বিধবা! বিধবার বিবাহ! না না, তিনি জীবন থাকিতে তাঁহার পুত্রস্থানীয়কে এমন অনাচার করিতে দিবেন না; কন্যাকে ব্রহ্মচর্য ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে দিবেন না!

তখন বিমল যূথিকার শরণাপন্ন হইল—যূথি, এত তুফান কাটিয়ে ঘাটের কাছাকাছি এসে আমাদের মিলন-তরণীকে অকূলের দিকে ভাসিয়ে দিয়ো না।

যূথিকা চোখের জলের ভিতর দিয়া বিমলের মুখের দিকে সান্ত্বনার দৃষ্টিপাত করিয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল—তোমাকে ছেড়ে যাওয়া কি আমারই বড় সুখের। কিন্তু কি করব, উপায়

নেই! যিনি এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর আমাদের স্মৃতি নিয়েই কাটিয়েছেন, আমাদেরই জন্যে যিনি বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করেছেন, তিনি আমার পিতা ও আশ্রয়; তাঁকে কষ্ট দেবো কেমন ক'রে? আমাকে বিয়ে ক'রে তুমিও সুখী হতে পারবে না, আমিও সুখী হতে পারব না।

বিমল আশ্চর্য ও চমকিত হইয়া বলিল—একি অসম্ভব কথা বলছ যূথি? তোমায় পেলে আমি সুখী হব না? আর তোমাকে সুখী করবার জন্যে যে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে পারি যূথি, তবু তোমাকে সুখী করতে পারবো না? বিত্ত ঐশ্বর্য আমার নেই ব'লে কি চিত্তের ঐশ্বর্য........

যূথিকা বিমলের হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া ব্যথিত ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিতে লাগিল—আমাকে ভুল বুঝো না তুমি। আমি ঐশ্বর্যের লালসায় তোমার কাছে অকৃতজ্ঞ হতে পারি, তোমার ভালোবাসা তুচ্ছ করতে পারি এমন নীচ আমাকে ভেবো না। তোমাকে আমি সবার বেশী ভালোবাসি, ভক্তি করি ব'লেই আমি তোমার পত্নী হবার পরম সৌভাগ্য ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি, ত্যাগ করতে পারছি!

বিমল অবাক হইয়া যূথিকার কথা শুনিতেছিল। যূথিকা বলিতে লাগিল—তুমি আমায় বিয়ে করলে তোমার অতদিনের বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে; তোমার বন্ধু আর তাঁর আত্মীয়েরা মনে করবে, তুমি আমাকে পাবার জন্যেই তাদের বাড়ীতে এসে অতিথি হয়েছিলে; তাদের কুল কলঙ্কিত ক'রে তুমি স্বার্থসিদ্ধি করলে। তোমার পবিত্র চরিত্রে এই মিথ্যা অপবাদের কলঙ্ক আমি লাগতে দেবো না! তারপর অন্যের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ ক'রে তুমি যে নিজের বাড়ী

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, বাপ-মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে তাদের পর হয়ে যাবে, সমাজে নিন্দাভাজন ও বিদ্রূপের পাত্র হবে এই আমি হতে, তা' আমি হতে দিতে পারব না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমায় ভুল বুঝো না।

যূথিকা বিমলের দুই পা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বিমল তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, একটি সান্ত্বনার কথাও তাহার মুখে ফুটিল না। সে আসন্ন-ঝড় অমাবস্যা-রাত্রির সমুদ্রের মতন থমথম করিতেছিল। এখনই বুঝি তাহার হৃদয় প্রলয়ে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিমল খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—তবে হয় তুমি বর্মায় যেয়ো না, নয় আমাকেও বর্মায় যেতে বল। তোমায় যদি আমার ক'রে নাই পাই, তবু দেখতে ত' পাব! এই সুখটুকু থেকেও আমাকে বঞ্চিত করো না।

যূথিকা চোখের জল মুছিয়া কাতর দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চাহিয়া কান্নাভাঙ্গা কণ্ঠে বলিল—না, তাও হবে না! অত সুখের প্রলোভন সামনে রেখে আমি আপনাকে সামলে রাখতে পারব না! আমার মন বড় লোভী! ভালোবাসা যে বড় দুর্বল!

বিমল আর আপনার দুঃখের ভার ধারণ করিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। সে তাড়াতাড়ি যূথিকার নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

যূথিকা অশ্রুপ্লাবিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে দেখিতে দেখিতে মনের মধ্যে আর্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিল—যাও বন্ধু, যাও প্রিয়তম! এই অভাগিনীর জন্যে তোমার জীবনটাকে আমি ব্যর্থ পণ্ড হয়ে যেতে দেবো না! আমায় তুমি ভুলে যেয়ো—আমার স্মৃতি যেন তোমার

গৃহস্থালির সুখ থেকে, পত্নী-পুত্র-লাভের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না ক'রে রাখে! আমার মনের মন্দিরে পূজার বেদীতে তোমার আসন অটুট থাকবে!

পরদিন অমৃতবাবু নবলব্ধ কন্যাকে লইয়া বর্মা যাত্রার জন্য পাবনা হইতে রওনা হইলেন। বিমলও সঙ্গে চলিল। যূথিকা বারবার মিনতি করিয়া বিমলকে বলিতে লাগিল—তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আর ফিরো না, তুমি বাড়ী যাও।

বিমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আমার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণীকে খুঁজে খুঁজে পথে পথে ফেরার এই ত' শেষ, বাড়ীতে ত' এবার ফিরবই, কলকাতা পর্যন্ত সঙ্গে যেতে দাও।

যূথিকা বিমলের হাসি দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে ছেড়ে যাও—অধিক দিন এক সঙ্গে থেকে বিদায়ের ক্ষণটিকে বেশী অসহ্য ক'রে তুলো না!

বিমল তেমনি হাসিয়া বলিল—ক্রমশই ত' সময় নিকট হয়ে আসছে, আর ত' বেশী বিলম্ব নেই! তারপর জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি!

কলিকাতার চাঁদপাল ঘাটে বর্মা-যাত্রী জাহাজে যাত্রী চড়িবার হুড়াহুড়ি লাগিয়াছে। তোরঙ্গ, বাক্স, বিছানা, মোট, পোঁটলা-পুঁটলি মুটের মাথায়-মাথায় সারি দিয়া চলিয়াছে। যাত্রীদলও বিচিত্র রকমের—নানা জাতীয়, নানা পরিচ্ছদের, নানা রঙের ; য়ুরোপীয়, মগ, চীনা, মাদ্রাজী, বাঙালী, পাঞ্জাবী। একজন বাঙালী ফার্ষ্ট ক্লাশের যাত্রী। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সেও দীর্ঘবলিষ্ঠ গৌরবর্ণের সুশ্রী চেহারা ও ফিট্‌ফাট্ বেশভূষা দেখিয়া সকলের সসম্ভ্রম দৃষ্টি তাঁহার উপরেই পড়িতেছিল এবং তিনি নিকটে আসিলেই সকলে তটস্থ হইয়া সরিয়া যাইতেছিল ; তাঁহার পশ্চাতে একজন সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যুবক একটি অনুপমা রূপসী তরুণীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে জাহাজের জেটিতে যাইতেছিল। সকলেই দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছিল যুবকটি অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে আপনার অগাধ মর্মন্তুদ দুঃখ দমন করিয়া রাখিবার জন্য অমানুষী চেষ্টা করিতেছিল। মেয়েটির দুঃখের চিহ্ন আরো স্পষ্ট ; তাহার বড় বড় টানা টানা চোখ দুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে ; নিরুদ্ধ তীব্র শোকের ছোপ লাগিয়া তাহার কপাল, গাল ও কণ্ঠের লালিমা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের দেখিয়া কত লোকে কত রকম আন্দাজ করিতে লাগিল—কেহ বলিল, মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে ; কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে উহার স্বামীর অমন শোকাকুল মূর্তি কেন? কেহ বলিল, ও বাপের বাড়ী যাইতেছে, স্বামীকে ছাড়িয়া যাইতেছে

বলিয়া দুজনের দুঃখ ! কত লোকে আহা করিল, কত লোকে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করিল।

উহারা জেটিতে আসিয়া এক পাশে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একে একে সব লোক ষ্টিমারে গিয়া চড়িল ; ষ্টিমার ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল ; এইবার আর একবার ঘণ্টা বাজিলেই জেটি হইতে ষ্টিমারে যাইবার তক্তা সরাইয়া লইবে বলিয়া খালাসিরা কেহ রশারশি ধরিয়া জাহাজের উপরে এবং কেহ বা তক্তা ধরিয়া জেটিতে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একখানি রেশমী রুমালে চোখ মুছিয়া সেই তরুণ-তরুণীর কাছে আসিয়া ব্যথিত মৃদু কম্পিত স্বরে বলিলেন—সময় ত' হয়ে গেল, এইবার চল মা !

তরুণী যুবকের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল । যুবক শত শত কৌতূহলী দৃষ্টি হইতে আপনার দরবিগলিত অশ্রুধারা লুকাইবার জন্য তরুণীর মাথার উপর মুখ নত করিল।

বৃদ্ধ তরুণীর কাঁধে হাত দিয়া আবার মৃদুস্বরে বলিলেন—"এস মা।" তারপর যুবকের দিকে ফিরিয়া করুণ মিনতির স্বরে বলিলেন-বাবা বিমল, তুমি যেতে বল।

বিমল সমস্ত প্রাণের বল প্রয়োগ করিয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরে ধীরে যূথিকাকে নিজের বক্ষ হইতে বিমুক্ত করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তক্তার উপর তুলিয়া দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—এ জন্মের মতন এই শেষ যূথিকা !

অমৃতবাবু আসিয়া নীরবে বিমলের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ; বিমল প্রণাম করিতে যখন নত হইল সেই অবসরে অমৃত-বাবু যূথিকাকে লইয়া তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিয়া গেলেন।

জাহাজের ধারে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া যূথিকা থরথর করিয়া

কাঁপিতেছিল। তাহার চারিদিকে যে ভিড় জমিয়া গিয়াছে সেদিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না, সে একদৃষ্টে বিমলের পাংশু মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।

আবার ঘণ্টা বাজিল! জাহাজের উপরের খালাসিরা রশায় টান মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—আল্লা রসুল পীর গাজি বদর বদর। আর অমনি নীচের খালাসিরা তক্তায় এক ঠেলা দিয়া খানিকটা সরাইয়া উহাদের উক্তিতে সাড়া দিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িল—হেঁইয়া!

তক্তা সরিয়া সরিয়া জেটি হইতে বিমুক্ত হইয়া গেল। জেটির খালাসিরা সেই শূন্যে দো'দুল্যমান তক্তার উপর দিয়া লঘু ক্ষিপ্র পদে লাফাইয়া লাফাইয়া জাহাজে উঠিয়া পড়িল। বিমল তখন রুমাল নাড়িয়া যূথিকাকে বিদায় দিয়া সেই রুমাল যেই চোখে দিয়াছে অমনি যূথিকা সমস্ত ভিড়ের মধ্য হইতে ছুটিয়া আসিয়া তক্তায় লাফাইয়া পড়িল এবং জাহাজের ও জেটির সকল লোক 'হাঁ হাঁ গেল গেল' করিতে করিতে তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবার পূর্বে সে জেটিতে লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া গিয়া বিমলের কণ্ঠলগ্ন হইল!

যূথিকা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল—না না, আমি তোমায় ছেড়ে স্বর্গেও যেতে পারব না। আমি তোমার কাছে থাকব, তুমি যা বলবে তাই শুনব। তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার আত্মীয়, তুমিই আমার সব!

বিমল আনন্দে অধীর হইয়া ব্যগ্র দুই বাহু দিয়া যূথিকাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিশ্বসংসার ভুলিয়া কৌতূহলী লোকেদের বিস্মিত দৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—যূথি, আমার যূথি! এসেছ, তুমি এসেছ! তুমি আমায় বাঁচালে—তোমার বিরহের অসহ্য দুঃখ সয়ে আমি বাঁচতাম না।

জাহাজ ছাড়িয়া জেটি হইতে অল্প সরিয়া গিয়াছিল ; আবার ভিড়িল ; আবার সিঁড়ি পড়িল। অমৃতবাবু নামিয়া আসিয়া যূথিকার কাঁধে হাত রাখিয়া বেদনা-বিরক্তি-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন—যূথি, এস মা, এ কী ছেলেমানুষী ! জাহাজ ছেড়ে যাবে যে !

বিমল আনন্দ উজ্জ্বল মুখ করিয়া বৃদ্ধকে বলিল—হাঁ অমৃতবাবু, জাহাজ ছেড়ে যাবে, আপনি শিগ্‌গির উঠে পড়ুন। যূথিকা আমার কাছেই থাক্‌বে।

বিস্মিত বৃদ্ধ যূথিকাকে বলিলেন—বিমল যা বলছে এ কি সত্যি হতে পারে মা ?

যূথিকা অতি-আনন্দের গর্বে লজ্জিত হইয়া বলিল—হাঁ বাবা, আমি মায়ের মেয়ে—মা যাকে ভালোবেসেছিলেন তারই সঙ্গ নিয়েছিলেন ; আমি যাঁর সঙ্গ নিচ্ছি তাঁকে আমি ভালোবাসি ! আমার জীবন, ধর্ম, মান, সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন ইনি। আমার মায়ের অন্তিম সময় নিশ্চিন্ত করেছিলেন ইনি। এঁকে আমি ত্যাগ কর্‌তে পারব না। জাহাজ যখন জেটি ছেড়ে সরে যাচ্ছিল, তখন জাহাজ আর জেটির মধ্যের ফাঁকে আমারই হৃদয় ফেটে যাওয়ার দারুণ ভয়ঙ্কর ছবি আমি দেখ্‌তে পেলাম, তাই আমি সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলাম না।

বৃদ্ধ অমৃতবাবু আর অশ্রু রোধ করিতে পারিলেন না। মমতা-বিগলিত স্বরে বলিলেন—তোমার প্রাণের কথাই তবে শোনো মা ; অচেনা একটা বুড়োর বুদ্ধির পরামর্শের চেয়ে তোমার নিজের প্রাণটা ঢের বেশী সত্য। এই যে মহৎপ্রাণকে তোমার প্রাণ এমন ব্যাকুল হয়ে চাচ্ছে, আমি জানি সে তোমায় সুখে রাখবে।……কিন্তু বাবা বিমল, অবিবাহিতা মাতার দুঃখ-লালিত কলঙ্কিত এই মেয়েটিকে

তোমার কুলীন বংশের গর্বিত আত্মীয়দের কাছে কেমন ক'রে নিয়ে যাবে? সমস্ত জগতের ঠাট্টা-টিটকারী সহ্য করতে পারবে কি বাবা?

জাহাজ ছাড়িবার আবার ঘণ্টা বাজিল। বিমল এক হাতে যূথিকাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া, আর এক হাতে বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া দৃপ্তভাবে বলিল—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান, সে জন্য কিছু ভাববেন না। আমি প্রণয়ের গৌরবে সমস্ত জগতের সাম্‌নে এই আমার জীবনলক্ষ্মীকে দেখিয়ে আনন্দের গর্বে বল্‌ব —এই আমার যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী!